আমার ধ্যানের ভারত

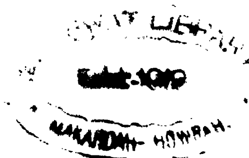
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ভূমিকা সমন্বিত

শ্রীর. কু. প্রভু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

অনুবাদক

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

—নবজীবন ট্রাষ্টের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত—

প্রথম সংস্করণ

—আড়াই টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২ হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
ও গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭, বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীফণিভূষণ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

আমরা যখন এক নূতন যুগের সন্ধিক্ষণে এসে উপনীত হয়েছি, তখন আমাদের দেশ এবং সারা দুনিয়ার সামনে মহাত্মা গান্ধীর ধ্যানের ভারতবর্ষের চিত্র উপস্থিত করা সুখের কথা। আমাদের অর্জ্জিত স্বরাজে আমরা ভারতের ভবিষ্যৎ রচনা করা বা নষ্ট করার অধিকার পেয়েছি। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের এ খুব নগণ্য অবদান নয়। সত্য এবং অহিংসা-রূপ যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আয়ুধ তিনি প্রয়োগ করেছিলেন, জগতের বহুবিধ রোগের আরোগ্যের জন্য তার প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান। গান্ধীজীকে যে সমস্ত সাধন প্রয়োগ করতে হয়েছিল, তাতে যথেষ্ট খুঁত ছিল এ কথা আমরা অবশ্য জানি; তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে যে, একই অবস্থায় অন্য যে কোন দেশের তুলনায় অল্পপরিমাণ আত্মত্যাগে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আয়ুধ আমাদের অনবদ্য ছিল বলে স্বাধীনতার ফলে যে সমস্ত সুযোগ আমরা পেয়েছি তাও তেমনি অনবদ্য। যিনি আমাদের পরিচালিত করেচেন, এবং যে শাশ্বত আদর্শ তাঁকে অনুপ্রাণিত করেচে, আমাদের জয়ের এবং আনন্দোৎসবের ক্ষণে তাকে আমরা ভুলতে পারি না। স্বাধীনতা হচ্চে এক বৃহত্তর এবং মহত্তর আদর্শে উপনীত হবার উপায়। মহাত্মা গান্ধী যে আদর্শের জন্য কাজ করে গেছেন এবং তিনি ছিলেন যার প্রতীক, তার সুষ্ঠু পরিণতি হচ্চে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ রচনা করা। এ সময়ে তাঁর শিক্ষার ভিত্তি এবং তাঁর আদর্শের মৌলিক উপাদানের কথা আবার আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। শুধু এই মৌলিক নীতিই নয়, বরং কি-করে আমরা আমাদের স্বাধীনতা মারফৎ আদর্শ শাসনব্যবস্থা এবং সমাজজীবন রচনা করে এ আদর্শ-

পরিপূর্ত্তির সহায়তা করতে পারি এবং আমাদের শাসনতন্ত্র মারফৎ বাইরের সব বন্ধন এবং আভ্যন্তরিক বাধা থেকে মুক্ত হয়ে কি-করে এই বিরাট দেশের মানবীয় উপাদান আমরা এ কাজে নিয়োগ করতে পারি, এ কথা পাঠকদের কাছে যে বই তুলে ধরে, সবাই তাকে অভিনন্দিত করবে। গান্ধীজীর লেখা থেকে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় এবং হৃদয়গ্রাহী অংশসমূহের নির্ব্বাচন করে শ্রী র, কৃ, প্রভু তাঁর দক্ষতা সপ্রমাণিত করেছেন এবং আমার কোন সন্দেহ নেই যে, এ বিষয়ে এ বইখানি একটি প্রয়োজনীয় সঙ্কলন বলে বিবেচিত হবে।

—রাজেন্দ্র প্রসাদ

নিউ দিল্লী
অক্টোবর, ১৯৪৬

অবতরণিকা

এই গ্রন্থে, মহাত্মা গান্ধীর লেখা এবং বক্তৃতার অংশসমূহ একত্রিত করে, তাঁর আদর্শের সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র ভারতের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা এবং দুনিয়ার অপরাপর অংশের সাথে তার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত তার মোটামুটি একটি ধারণা পাঠককে দেবার চেষ্টা করা হয়েচে। বিদেশী শাসনের যে শৃঙ্খলভার বিগত দেড় শতাব্দী যাবৎ ভারতের আত্মাকে দাসত্ববন্ধনে বেঁধে রেখে তার আর্থিক, পারমার্থিক এবং নৈতিক উন্নতিকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছিল, ১৯৪৭ খৃঃ অব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারত তার থেকে শেষ পর্য্যন্ত মুক্ত হতে চলেচে। অবশ্য এই স্বাধীনতা-অর্জ্জনের প্রচেষ্টায় বহু জায়গায় তার ঐক্যে ফাটল ধরেচে, সাংঘাতিক অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য তার আত্মা হয়েচে মারাত্মক ভাবে নিপিষ্ট। স্বরাজের যে রূপ আজ রূপায়িত হয়ে উঠেচে, তা ভারতের দেশপ্রেমিক সন্তান-সন্ততির বাঞ্ছিত বা যার জন্য এতদিন ধরে তারা সংগ্রাম করে এসেচে, সেই স্বরাজ নয়। সুতরাং এ খুবই স্বাভাবিক যে, ভারতের স্বাধীনতার জনক গান্ধীজী, আসন্ন স্বাধীনতা সম্বন্ধে উদ্দীপনা বোধ করার মত বিশেষ কিছু খুঁজে পাচ্চেন না, এবং বৈদিক ঋষিদের মত বলচেন, "আলোয় নিয়ে চল প্রভু অন্ধকারের মাঝ হতে"।

ভারতের মুসলমানরা যে "একটি পৃথক জাতি" এই অবাস্তব নীতি গান্ধীজী কখনও মেনে নেন নি। তিনি বলেচেন, "হিন্দুধর্ম্ম এবং ইসলাম যে দুটি পরস্পরবিরোধী সংস্কৃতি এবং ধর্ম্মমত এ কথা চিন্তা করতেই আমার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।" তাঁর অভিমত, "আমার কাছে এ রকম নীতি মেনে নেবার অর্থ হচ্চে ঈশ্বরকে অস্বীকার করা; কারণ সমস্ত অন্তর দিয়ে আমি বিশ্বাস করি যে কোরাণে উল্লিখিত ভগবান এবং গীতায় ভগবান এক ও

অভিন্ন, এবং যে নামেই তাঁকে ডাকা হ'ক না কেন, আমরা সবাই সেই একই ভগবানের সন্তান। সেদিন পর্য্যন্ত যে-সব লক্ষ লক্ষ ভারতীয় হিন্দু ছিল, ইস্লাম ধর্ম্ম অবলম্বন করায় যে তাদের জাতীয় সত্তা পৃথক হয়ে গেছে এ রকম মতবাদের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করব।" আজ যে ভাবে ভৌগোলিক বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারত-ব্যবচ্ছেদের প্রচেষ্টা চলচে, সেই রকম যে বরাবর থাকবে এ কথা বিশ্বাস করতে তিনি নারাজ। তিনি বলেন, "দুটি সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করলেই ভারতে দুটি জাতির সৃষ্টি হয় না।" এই বিশ্বাস নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন এবং কাজও করে যাবেন যে, ঐক্যের পথে বিদেশী শাসকবর্গ কর্ত্তৃক প্রোথিত কীলক-রূপ সর্ব্বাপেক্ষা দুরূহ বাধা অপসারিত হওয়া মাত্র এবং বর্ত্তমানে তার প্রতি যে সমস্ত আঘাত হানা হয়েচে তার আরোগ্য হওয়া মাত্র, অদূর ভবিষ্যতে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষ বাস্তব রূপ পরিগ্রহণ করবে।

এই গ্রন্থের সঙ্কলনকর্ত্তা তাঁর সামনে যে কি কঠিন কর্ত্তব্যভার এবং নিজের যোগ্যতাও যে কত কম, তা জানেন এবং এও জানেন যে এ রকম ভাবে পাঠক-বর্গের কাছে "গান্ধীজীর ধ্যানের ভারতবর্ষের" ছবি মেলে ধরার দায়িত্বও কত গভীর। ভাল ভাবেই তিনি এ কথা জানেন যে "ইয়ং ইণ্ডিয়া" এবং "হরি-জনের" পাতায় পাতায় এবং তাঁর অন্যান্য লেখা এবং বক্তৃতায় শিল্পি-সম্রাট যে চিত্র অঙ্কিত করেচেন, তার তুলনায় এ হবে কত অকিঞ্চিৎকর। গান্ধীজীর নিজেরই ভাষায় সেই চিত্রের সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হয়েচে বলে সঙ্কলনকর্ত্তা আশা করেন যে হয়ত সত্যের খুব বেশী অপলাপ করা হয়নি। এ সত্ত্বেও এই গ্রন্থে যে সব ত্রুটিবিচ্যুতি রয়ে গেছে তার জন্য সঙ্কলনকর্ত্তা গান্ধীজী ও পাঠক উভয়ের কাছে সত্য সত্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

র. কু. প্রভু

অনুবাদকের ভূমিকা

এই বইটির অনুবাদের কাজ সারা হয় প্রায় বছর খানেক আগে। নবজীবন ট্রাষ্টের কাছ থেকে এটি প্রকাশ করার অনুমতি পেতে দেরী হবার জন্য এতদিনে বইটি প্রকাশিত হচ্চে। এ ছাড়া, প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ' কোম্পানী এবং তাঁদের তরফ থেকে সুসাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র বইটি প্রকাশ করার দায়িত্বভার না নিলে আরও কতদিন যে এ'কে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতে হ'ত তা বলা যায় না। সর্ব্বশেষে উল্লেখ করলেও, এই বইটির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য পেয়েছি অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসুর কাছ থেকে। তাঁর সহায়তা ছাড়া বইটি কোনদিনই প্রকাশিত হ'ত কিনা সন্দেহ। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বইটি পড়ে আমাদের মধ্যে কয়েকজনও যদি গান্ধীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর ধ্যানের ভারতবর্ষকে রূপ দেবার ব্রত গ্রহণ করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বুঝব।

কংগ্রেস অফিস
জামসেদপুর

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

আমার ধ্যানের ভারত

ভারতের সব কিছুই আমাকে আকর্ষণ করে। উচ্চাভিলাষসম্পন্ন একজন মানুষের যা কিছু কাম্য থাকতে পারে, তার সবই এখানে আছে।

ভারত মুখ্যত কর্ম্মভূমি, ভোগভূমি নয়।

আমার মনে হয়, ভারতের আদর্শ অন্যের মত নয়। দুনিয়াতে ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনা করার কাজে ভারতই উপযুক্ত। স্বেচ্ছায় এই দেশ যে আত্মশুদ্ধির পথ বেছে নিয়েচে, দুনিয়াতে তার তুলনা নেই। ইস্পাতে তৈরী অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন ভারতের বিশেষ নেই। ঐশী শক্তির অস্ত্রে ভারত সংগ্রাম করে এসেচে; এবং এখনও ভারত তা করতে পারে। অন্যান্য জাতিসমূহ পশুশক্তির উপাসক......ভারত আত্মার শক্তিতে সবকিছু জয় করতে পারে। আত্মার শক্তির কাছে পশুশক্তি যে তুচ্ছ তার বহু প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়। কবি তার জয়গাথা গেয়েচেন এবং ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টাগণ স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে গেছেন।

এমন এক শাসনতন্ত্র কায়েম করার আমি চেষ্টা করব, যার ফলে ভারত সব রকম দাসত্ব এবং অভিভাবকত্বপাশ থেকে মুক্তি পাবে এবং প্রয়োজন হ'লে ভারতকে পাপ করারও অধিকার দেবে। এমন এক ভারত সৃষ্টি করার জন্য আমি কাজ করে যাব, যেখানে দরিদ্রতমও অনুভব করবে যে এ তারই দেশ এবং এর উন্নতির পথে তার মতামতও যথাযোগ্য মর্য্যাদা পাবে; এমন এক ভারত, যেখানে মানুষের মধ্যে উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ থাকবে না এবং যেখানে সকল সম্প্রদায় সম্পূর্ণ সৌহার্দ্দের মধ্যে বসবাস

করবে। এই ভারতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ বা সুরা ইত্যাদি মাদকদ্রব্যের স্থান নেই। নারী, পুরুষের সমান অধিকার ভোগ করবে। দুনিয়ার অপরাপর অংশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হবে শান্তিপূর্ণ, আর আমরা অপর কাউকে শোষণ করব না বা কারও দ্বারা শোষিত হব না বলে আমাদের সৈন্যবাহিনী হবে যথাসম্ভব ক্ষুদ্র। কোটি কোটি মূক জনসাধারণের হিতের পরিপন্থী না হলে, ভারতীয় কিংবা অভারতীয় স্বার্থসমূহকে সততার সাথে যোগ্য মর্য্যাদা দেওয়া হবে। বিদেশী এবং ভারতীয়দের মধ্যে পার্থক্য রাখা আমি ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করি।...এই আমার ধ্যানের ভারতবর্ষ ......অন্য কিছুতেই আমি সন্তুষ্ট হব না।

ভারত হচ্চে দুনিয়ার সেই সব অল্পসংখ্যক রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যতম, যারা তাদের প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থার কিছু কিছু—তা ভ্রান্ত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন হলেও—আজ পর্য্যন্ত বজায় রেখেচে। তবে ভ্রান্তি বা কুসংস্কার থেকে মুক্ত হবার স্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয়, অদ্যাবধি ভারত দেখিয়েচে। ভারতের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের সম্মুখে যে অর্থ নৈতিক সমস্যা বর্ত্তমান, তার সমাধান করার যোগ্যতা যে তার আছে এ বিষয়ে আমার বিশ্বাস পূর্ব্বাপেক্ষা আজ দৃঢ়।

ভারতকে আমি স্বাধীন এবং শক্তিশালী এইজন্য দেখতে চাই, যেন দুনিয়ার উন্নতিকল্পে ভারত স্বেচ্ছায় পবিত্র মনে নিজেকে উৎসর্গ করতে পারে। ভারতের স্বাধীনতার ফলে সংগ্রাম ও শান্তি সম্পর্কীয় দুনিয়ার দৃষ্টি-ভঙ্গীতে বিপ্লব এনে দিতে হবে। তার প্রাধান্য সমগ্র মানবজাতির উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ইউরোপের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত ভারত মানবতাকে কোনই আশার বাণী শোনাতে পারে না। জাগ্রত এবং মুক্ত ভারতবর্ষ দুনিয়াকে শান্তি এবং শুভেচ্ছার বাণী শোনাবে।

অহিংস পন্থায় স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করাই ভারতের পক্ষে, স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকারী ভিন্নদেশীয় জনগণের কাছে, নিঃসন্দেহে তার স্বকীয় বাণী শোনানোর সমতুল্য হবে ; এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্চে এই যে, দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে এই হবে ভারতের তরফ থেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান।

ভারতের যে সংস্কৃতি, সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও, এখনও কালের ধ্বংসলীলার মধ্যে বজায় আছে, তার প্রতি যে-কোন অসঙ্গত বলপ্রয়োগ প্রতিরোধ করার মত এবং সহিষ্ণুতারূপ অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাবার মত ধৈর্য্য ভারতের থাকলে, আমি বিশ্বাস করি যে, দুনিয়ার শান্তি ও উন্নতির পথে ভারতের স্থায়ী কিছু অবদান থেকে যাবে।

স্বদেশের মুক্তি আমি এই কারণে চাই যে, অন্যান্য দেশ আমার স্বাধীন দেশের কাছ থেকে শিখুক, আমাদের দেশের সম্পদ সমগ্র মানবতার মঙ্গলের জন্য ব্যবহৃত হ'ক। স্বদেশভক্তির ধর্ম্ম আজ যেমন আমাদের শিক্ষা দেয় যে, পরিবারের জন্য ব্যক্তিকে, গ্রামের জন্য পরিবারকে, জেলার জন্য গ্রামকে, প্রদেশের জন্য জেলাকে এবং সমস্ত দেশের জন্য প্রদেশকে আত্মোৎসর্গ করতে হবে, সেই ভাবে কোন দেশের এইজন্য মুক্তি পাওয়া দরকার, যেন প্রয়োজন হলে সে দেশ সমগ্র বিশ্বের মঙ্গলের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারে। জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আমার ধারণা হচ্চে এই যে, আমার দেশ স্বাধীনতা অর্জ্জন করুক এবং প্রয়োজন হলে মানবসমাজকে রক্ষা করার জন্য সমস্ত দেশবাসী জীবনদান করুক। এই ধরণের জাতীয়তাবাদেরই আমি অনুরাগী। জাতিগত ঈর্ষার স্থান এখানে নেই। এই হয় যেন আমাদের জাতীয়তাবাদ।

আমি চাই ভারত উপলব্ধি করুক যে, তার আত্মা অবিনশ্বর এবং সমস্ত রকমের শারীরিক জড়তার উর্দ্ধে বিরাজিত হয়ে এ সারা দুনিয়ার শারীরিক শক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে পারে।

জঙ্গী নীতি গ্রহণ করলে ভারত সাময়িক জয়লাভ করতে পারে। সে অবস্থায় ভারত আর আমার হৃদয়ের গৌরব স্বরূপ হয়ে থাকবে না। সব কিছুই আমি ভারতবর্ষের কাছ থেকে পেয়েছি বলে আমি তার সঙ্গে এত দৃঢ়সংলগ্ন। আমি নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করি যে, ভারত দুনিয়াকে এক নূতন বাণী শোনাবে। ইউরোপকে অন্ধভাবে ভারত অনুকরণ করবে না। ভারত জঙ্গী নীতি গ্রহণ করলে, সে হবে আমার পক্ষে এক পরীক্ষার মুহূর্ত্ত। আমার বিশ্বাস, সে সময় আমার ভিতর দুর্ব্বলতা দেখা দেবে না। আমার ধর্ম্মের কোন ভৌগোলিক সীমারেখা নেই। কর্ত্তব্যে আমার স্থির বিশ্বাস থাকলে, আমার ভারতবর্ষের প্রতি ভক্তিকেও সে অতিক্রম করবে। অহিংসা-ধর্ম্মের দ্বারা ভারতবর্ষের সেবা করার জন্যেই আমার জীবন উৎসর্গীকৃত।

সমস্ত জগতের মঙ্গলের জন্যেই আমি ভারতের অভ্যুত্থান চাই। আমি চাই না যে, অপরাপর জাতিকে ধ্বংস করে ভারতের অভ্যুদয় হ'ক। সুতরাং ভারত শক্তিশালী এবং সমর্থ হ'লে বিশ্বের দরবারে তার শিল্পসম্পদ বা স্বাস্থ্যোন্নতিকর মসলাদি পাঠাবে, কিন্তু আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকলেও মাদক দ্রব্য রপ্তানি করবে না।

যে রক্তাক্ত পথ অবলম্বন করার জন্য পাশ্চাত্যের দেহে আজ ক্লান্তির চিহ্ন সুপরিস্ফুট, সে পথ ভারতের নয়। সরল এবং সাদাসিধে জীবনযাত্রার ভিতর দিয়ে যে-পথে বিনারক্তপাতে শান্তি আসে, সেই হচ্চে ভারতের পথ। আত্মার বিনষ্টির আশঙ্কা ভারতের সম্মুখে বিদ্যমান। আত্মাকে ধ্বংস করে ভারত বাঁচতে পারে না। ভারত যেন অসহায় এবং অলস ভাবে না বলে—'পাশ্চাত্যের অভিযানকে বাধা দিতে পারচি না।' নিজের এবং সারা বিশ্বের জন্য এ'কে প্রতিরোধ করার শক্তি তার থাকা দরকার। ভারত আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলে এবং লালসা বা শোষণেচ্ছা তার চিত্তে বিকার

আনতে সমর্থ না হ'লে পাশ্চাত্য বা প্রাচ্যের কোন শক্তিই আর লোভাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে নজর দেবে না এবং ব্যয়বহুল রণসজ্জার বোঝা বহন না করা সত্ত্বেও ভারত নিরাপত্তা বোধ করবে। কোন বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিই হবে তার পক্ষে নিরাপদ দুর্গ-স্বরূপ।

স্বাধীনতার চেয়ে আরও কিছু মহৎ আদর্শ আমার কাম্য। তথাকথিত দুর্ব্বল দেশসমূহকে, ভারতের স্বাধীনতা দ্বারা, পীড়নমূলক পাশ্চাত্য শোষণ থেকে আমি মুক্তি দিতে চাই।

যথোচিত দীনতা সহকারে আমি নিবেদন করতে চাই যে, সত্য এবং অহিংসা দ্বারা ভারত তার লক্ষ্যে উপনীত হ'লে, যে আন্তর্জাতিক শক্তির জন্য সমগ্র জাতিপুঞ্জ প্রাণপণ চেষ্টা করচে, তার ক্ষেত্রে ভারতের অবদানকে মোটেই নগণ্য বলা চলবে না এবং তাহ'লে যে সমস্ত জাতি তাকে মুক্তহস্তে সাহায্য দিয়েচে তাদের সে দানের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিদানও দেওয়া হবে।

ভারী যন্ত্রশিল্পের উপর নির্ভরশীল হ'লে ভারত স্বভাবতই অন্যান্য দেশকে শোষণ করা সুরু করবে। এ অবস্থায় অন্যান্য দেশের পক্ষে ভারত অভিশাপ-স্বরূপ হয়ে উঠবে এবং দুনিয়ার কাছে ভারত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আমার জীবিতাবস্থায় হিংসাকে যদি ভারত তার নীতি হিসাবে গ্রহণ করে তবে ভারতে বাস করার জন্য আমি মোটেই আগ্রহ প্রকাশ করব না। ভারত আর আমার মনে শ্লাঘা সৃষ্টি করতে পারবে না। ধর্ম্মের পর হচ্ছে দেশপ্রীতির স্থান। আধ্যাত্মিক ক্ষুধার প্রয়োজনীয় খোরাক জোগায় বলে মাতৃবক্ষসংলগ্ন শিশুর মত ভারতকে আমি আঁকড়ে থাকি। তার পারিপার্শ্বিকতাকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসা করি। সে বিশ্বাস লুপ্ত হ'লে নিজেকে মনে হবে অনাথ বালকের মত, ভবিষ্যতে অভিভাবককে খুঁজে পাবার যার আর আশা নেই।

এ কথা আমি জানি যে, অহিংস উপায়ে ভারত তার লক্ষ্যে উপনীত হ'লে কখনও তার এক বিরাট সৈন্যবাহিনী, সেই অনুপাতের নৌবাহিনী বা বা ততোধিক উৎকৃষ্ট বিমানবাহিনীর প্রয়োজন হবে না।

স্বাধীনতার সংগ্রামে অহিংস ভাবে বিজয়ী হবার মত উচ্চস্তরে যদি তার আত্মসচেতনতা পৌঁছয় তবে জগতে বহু পরিবর্তন সাধিত হবে এবং আজকের বহুবিধ রণসজ্জা অকার্য্যকরী হয়ে যাবে। এ রকম ভারত শুধু স্বপ্ন হয়েই থেকে যেতে পারে বা এ'কে ছেলেমি মনে হ'তে পারে। কিন্তু অহিংস উপায়ে ভারতের স্বাধীন হবার অর্থ আমার কাছে এই। সেই স্বাধীনতা গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে এক সহজ আপোষ-নিষ্পত্তি মারফৎ আসবে। তবে সে বৃটেন উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী বা কৌশলে জগতে প্রাধান্য স্থাপনে ইচ্ছুক হবে না, মানবতার বিনয়ী সেবক হ'তে হবে তাকে। শোষণের উদ্দেশ্যে বৃটেন কর্তৃক আরব্ধ সংগ্রামে তখন আর ভারতকে অসহায়ভাবে ঠেলে দেওয়া হবে না, বরং দুনিয়ার হিংসোন্মত্ত শক্তিসমূহকে সংযত করবার বাণীই তার শক্তিশালী কণ্ঠে ধ্বনিত হবে।

জাতীয় সরকার কি নীতি গ্রহণ করবে তা আমি বলতে পারি না। আমার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলেও সে সময় পর্য্যন্ত আমি নাও জীবিত থাকতে পারি। জীবিত থাকলে, অহিংসাকে যথাসম্ভব কঠোর ভাবে গ্রহণ করার পরামর্শ আমি দেব। আন্তর্জ্জাতিক শক্তির ক্ষেত্রে এবং এক নূতন দুনিয়া সৃষ্টির পথে এই হবে ভারতের শ্রেষ্ঠ অবদান। ভারতে এত সামরিক জাতি থাকার জন্য আমার মনে হয় যে তৎকালীন সরকারে তাদের যথেষ্ট প্রভাব থাকবে এবং জাতির নীতিও কিঞ্চিৎ পরিমার্জ্জিত আকারে সামরিকতার দিকে ঝুঁকবে।

আমার আশা আছে যে, রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে অহিংসার শক্তি প্রমাণ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে না এবং খাঁটি অহিংসার ধারক একটি শক্তিশালী দল তখন দেশে থাকবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ণ স্বরাজ

'স্বরাজ' শব্দটির উদ্ভব বেদ থেকে এবং এ অতি পবিত্র শব্দ। কখন কখন স্বাধীনতার অর্থে সংযমের সকল বন্ধন থেকে মুক্তি মনে হ'তে পারে, স্বরাজের অর্থ কিন্তু তা নয়। এর অর্থ হচ্ছে স্বায়ত্ত-শাসন এবং আত্মসংযম।

নরনারী-নির্ব্বিশেষে, দেশীয় বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিদেশীয়, প্রত্যেক সাবালক, যাঁরা রাষ্ট্রের সেবার জন্য শারীরিক শ্রম দান করেন এবং নিজের নাম মতদাতাদের (ভোটারের) তালিকায় লিপিবদ্ধ করিয়েছেন, তাঁদের সংখ্যাধিক্যের মতামত দ্বারা নির্ব্বাচিত ভারতীয় সরকারকে আমি স্বরাজ নামে অভিহিত করি। কয়েকজন ক্ষমতা দখল করলেই খাঁটি স্বরাজ আসবে না। সকলে ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জ্জন করলে তবেই আসবে স্বরাজ। অর্থাৎ ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করার শক্তি সম্বন্ধে সচেতন করার শিক্ষা জনসাধারণকে দেওয়ার মারফৎই স্বরাজ অর্জ্জন করতে হবে। স্বায়ত্ত-শাসন নির্ভর করে আমাদের অভ্যন্তরীণ শক্তির উপর, চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম করার সামর্থ্যের উপর। যে স্বায়ত্ত-শাসন এই আদর্শে পৌঁছানোর জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে না বা এই আদর্শকে বজায় রাখার জন্য অবিরত চেষ্টা করে না, তা ঐ নামের অযোগ্য। সুতরাং কথায় এবং কাজে আমি এই বিষয় প্রমাণ করার চেষ্টাই করচি যে, রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসন, অর্থাৎ বহুলসংখ্যক নরনারীর জন্য স্বায়ত্ত-শাসন, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের চেয়ে এমন কিছু শ্রেয় নয়,

বরং সেইজন্য ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ঠিক যে পন্থায় অর্জ্জন করতে হয়, ঠিক সেই পথেই এ অর্জ্জন করতে হবে।

আমার কাছে স্বরাজের অর্থ হচ্চে আমাদের দীনতম স্বদেশীয়দের মুক্তি। শুধু ইংরেজের জোয়ালের কবল থেকে ভারতকে মুক্তি দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। যে কোন দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে ভারতকে মুক্ত করতে আমি কৃতনিশ্চয়। শুধু শাসকের পরিবর্ত্তনে আমার অভিরুচি নেই।

অহিংস উপায়ে অর্জ্জিত স্বরাজের অর্থ বিশৃঙ্খলা বা অরাজকতা নয়। অহিংস স্বরাজ হবে প্রগতিশীল এবং শান্তিপূর্ণ বিপ্লব। মুষ্টিমেয় রাজপ্রতিনিধির হাত থেকে জনসাধারণের প্রতিভূর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার ব্যাপার সযত্নে পুষ্ট বৃক্ষ হ'তে সুপরিপক্ক ফলের পতনের মতই স্বাভাবিক হবে। আমি জানি যে, অহিংসার তাৎপর্য্য এর তিলমাত্র ন্যূন নয়।

সরকারের সহযোগিতা বা হস্তক্ষেপ ছাড়া আমাদের মত এক বিরাট এবং প্রাচীন জাতির চলার পথে উদ্ভূত বিভিন্ন ধরণের জটিল সমস্যাসমূহের সমাধান করার ক্ষমতার উপর আমাদের স্বরাজ লাভের যোগ্যতা নির্ভর করে।

আমাদের সভ্যতার প্রতিভাকে অটুট রাখাই আমার স্বরাজ। আমি বহু নূতন বিষয়ে লিখতে চাই কিন্তু সে সবই ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে লিখতে হবে। উপযুক্ত সুদ সহ পরিশোধ করার ক্ষমতা থাকলে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে সানন্দে ঋণ গ্রহণ করব।

শুধু ইংরেজকে তাড়ালেই ভারতে স্বরাজ স্থাপিত হবে না। অবশ্য আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে লড়াই আমরা করবই। ততঃ কিম্? আমরা কি বর্ব্বরের ন্যায় আচরণ করার স্বাধীনতা চাই? অপরের কাছ থেকে কোন রকম বাধা পাবার সম্ভাবনা নাশ করে খোঁয়াড়ের শূকরের মতই কি আমরা বাস করতে চাই? না। আমরা এমন এক স্বরাজ চাই যেখানে প্রত্যেক মানুষ ও

প্রত্যেক জিনিস যথাযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত। শুধু নিজেদের চারিধার পরিষ্কার রেখে প্রতিবেশীর অপরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করলে আমরা স্বরাজের অযোগ্য বলে বিবেচিত হব।

পার্লামেন্টের আইন আমাদের নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা দিতে পারে। গ্রামোন্নয়ন, মিতাচার, হিন্দু মুস্লিম ঐক্য, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান আমরা যদি না করতে পারি, তবে এ শুধু অলীক কল্পনাই থেকে যাবে এবং এতে কারও মঙ্গল হবে না। মূলত এই সকল সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাই হচ্ছে আমাদের বাঞ্ছিত জনগণের স্বরাজের প্রথম ও শেষ কথা।

এমন কি, শুধু স্বাধীন শাসনতন্ত্রকে কোন আদর্শ ব্যবস্থা বলা যেতে পারে না। বর্ত্তমান শাসনের মারাত্মক ত্রুটিসমূহের দূরীকরণের জন্যই স্বাধীনতার প্রয়োজন। শুধু ইংরেজ সরে যাওয়াই স্বাধীনতা নয়। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি মারফৎ স্বয়ং সে নিজের বিধানের রচয়িতা এবং নিজের ভাগ্যের স্রষ্টা এই চেতনা প্রত্যেক গ্রামবাসীর ভিতরে আসাই এর অর্থ।

স্বরাজের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে এই যে, সমগ্র দুনিয়ার বিরুদ্ধেও উপনিবেশের (কমনওয়েলথের) প্রত্যেক সদস্য নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে।

আমাদের সুসভ্য করা এবং আমাদের সংস্কৃতিকে মলিনতামুক্ত করে স্থায়ী করা যদি স্বরাজের উদ্দেশ্য না হয়, তবে তার কোনই মূল্য নেই। আমাদের সভ্যতার সারমর্ম্ম হচ্ছে এই যে, সর্ব্বজনীন বা ব্যক্তিগত সকল ব্যাপারেই নৈতিকতাকে আমরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে থাকি।

আমার বা আমাদের কল্পিত স্বরাজে ধর্ম্মগত বা জাতিগত কোন পার্থক্য নেই। শিক্ষিত সমাজের একচেটে ব্যাপার এ হবে না। বিকলাঙ্গ, অজ্ঞ, এবং বুভুক্ষু কোটি কোটি জনসাধারণ এবং পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায়সমূহ সহ স্বরাজ সকলেরই হবে।

লোকে বলে ভারতীয় স্বরাজ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অর্থাৎ হিন্দুদের রাজত্ব হবে। এর চেয়ে ভুল আর কিছু হ'তে পারে না। এ সত্য হ'লে আমি অন্তত তাকে স্বরাজ নামে অভিহিত করব না এবং আমার সকল শক্তি দিয়ে এর প্রতিরোধ করব। কারণ আমার কাছে হিন্দ্ স্বরাজের অর্থ হচ্চে সমগ্র জনসাধারণের রাজত্ব—ন্যায়ের রাজত্ব। সেই শাসনব্যবস্থার অধীন মন্ত্রিবর্গ হিন্দু, মুসলমান বা শিখ যাই হ'ন, হিন্দু, মুসলমান অথবা অপর যে কোন এক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপরিষদ গঠিত হ'ক না কেন, তাঁদের নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার করতেই হবে। পূর্ণ স্বরাজ এইজন্য পবিত্র যে, জাতি, ধর্ম্ম এবং সামাজিক অবস্থা নির্ব্বিশেষে যেমন রাজার জন্য, তেমনিই আবার কৃষকের জন্যও, ধনী ভূস্বামীর জন্য যেমন, তেমনি ভূমিহীন চাষীর জন্য, যেমন হিন্দুর জন্য তেমনি মুসলমানের জন্য, যেমন পার্শি বা খৃষ্টানের জন্য তেমনি আবার জৈন, ইহুদি বা শিখের জন্য এই স্বরাজ।

'পূর্ণ' কথাটি থাকায় এবং সত্য ও অহিংসা দ্বারা আমরা লক্ষ্যে উপনীত হ'তে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায় স্বরাজী শাসনব্যবস্থায় কারও কাছে বেশী আর কারও কাছে কম সুবিধা আসার সম্ভাবনা নেই এবং কারও প্রতি বিশেষ অনুরাগী বা কারও প্রতি বীতরাগ হবারও সম্ভাবনা নেই।

আমার ধ্যানের স্বরাজ দরিদ্র জনসাধারণের। রাজন্যবর্গ বা ধনিকবর্গ জীবনধারণোপযোগী যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী পায়, তার সব কিছুর সুবিধা আপনাদেরও পাওয়া দরকার। তবে তার অর্থ এ নয় যে, আজকের এই সব প্রাসাদ-আদি তাদের থেকে যাবে। সুখের জন্য এর প্রয়োজন নেই। আপনি আমি তাতে নিজেদের হারিয়ে ফেলব। তবে জীবনযাত্রার উপযোগী দ্রব্যসমূহের যে প্রাচুর্য্য একজন ধনী উপভোগ করে, তা আপনাদের পাওয়া দরকার। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, স্বরাজের ছত্রচ্ছায়ায়

এই সব প্রাচুর্য্যের প্রতিশ্রুতি না থাকলে তাকে পূর্ণ স্বরাজ বলা যেতে পারে না।

বিচ্ছিন্ন স্বাতন্ত্র্য আমার ধারণায় পূর্ণ স্বরাজ নয়। এর অর্থ সাবলীল এবং সম্মানজনক স্বাধীনতা। আমার জাতীয়তাবাদ তীব্র হ'লেও অনুদার নয় বা কোন জাতি বা ব্যক্তির ক্ষতির উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নয়। আইনগত বাধ্য-বাধকতা নৈতিক বাধ্যবাধকতার মত দৃঢ় নয়। এই শাশ্বত সত্যে আমি বিশ্বাসী যে 'নিজ সম্পদ এমন ভাবে ব্যবহার কর যাতে প্রতিবেশীর অসুবিধা না হয়।'

পূর্ণ স্বরাজের আমরা যে সংজ্ঞা করি বা এর দ্বারা যা অর্জ্জন করতে চাই তার উপরই এ সব কিছু নির্ভর করে। জনগণের মধ্যে জাগৃতি আনা বা তাদের সঠিক অধিকার সম্বন্ধে চেতনা দেওয়া এবং সমগ্র দুনিয়ার বিরোধিতা সত্ত্বেও সেই আদর্শের সেবা করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করা যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, এবং পূর্ণ স্বরাজ মারফৎ যদি আমরা সৌহার্দ্দ স্থাপনা করতে চাই বা অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাক্রমণের হাত থেকে মুক্তি চাই, জনগণের অর্থ নৈতিক অবস্থার যদি আমরা প্রগতিশীল পরিবর্ত্তন চাই, তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছাড়াই, অথবা সোজাসুজি কর্ত্তৃপক্ষকে প্রভাবান্বিত করে, আমরা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারি। ন্যায়সঙ্গত কার্য্য দ্বারা অর্জ্জিত শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কোন জাতিকে স্বাধীন এবং শক্তিশালী করতে হ'লে যে সমস্ত কার্য্যক্রম গ্রহণ করা দরকার, স্বরাজ হচ্ছে তারই সমষ্টি।

স্বরাজ-সম্বন্ধীয় আমার মতবাদ সম্বন্ধে যেন কোন ভ্রান্ত ধারণা না থাকে। বিদেশী শাসনপাশ থেকে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা এবং পূর্ণ অর্থ নৈতিক স্বাতন্ত্র্য হচ্ছে এর অর্থ। সুতরাং এর একদিকে হচ্ছে রাজনৈতিক এবং অপর দিকে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা। এ ছাড়া এর আরও দুটি দিক আছে।

তার মধ্যে একটি হচ্ছে নৈতিক এবং সামাজিক আর তৎসন্নিহিত অপর দিকটি হচ্ছে উদারতম অর্থে প্রযুক্ত ধর্ম। হিন্দুধর্ম, ইসলাম, খৃষ্টানত্ব ইত্যাদি সব কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত হ'লেও এ সবকিছুরই চেয়ে এ শ্রেষ্ঠ। এগুলিকে আমরা স্বরাজের চারটি বাহু বলে আখ্যা দিতে পারি, এবং এর যে কোন একটি দিক বিষম হ'লে, সমস্ত স্বরাজ-রূপ চতুর্ভুজটিই বিকৃত হয়ে যাবে। সত্য এবং অহিংসা বিনা অর্থাৎ ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাস বিনা কংগ্রেস-কথিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা অর্জ্জন করতে পারব না বলে এই নৈতিক এবং সামাজিক বিবর্ত্তনের প্রয়োজন।

সত্য এবং অহিংসা দ্বারাই আমাদের স্বরাজ অর্জ্জিত, পরিচালিত এবং রক্ষিত হবে এই বিশ্বাস আমাদের সকলের মনে দৃঢ়মূল হ'লে আমার কল্পিত স্বরাজ বাস্তবরূপ পরিগ্রহণ করবে। অসত্য এবং হিংসার পথে কখনই খাঁটি গণতন্ত্র বা জনগণের স্বরাজ আসতে পারে না, কারণ দমননীতির প্রয়োগে যাবতীয় বিরোধিতার অবসান ঘটানো এবং বিপক্ষদলকে নির্ম্মূল করাই এ পথের স্বাভাবিক পরিণতি, এতে স্বাধীনতা আসে না। অবিমিশ্র অহিংসার আওতাতেই ব্যক্তিস্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।

অহিংসার ভিত্তিতে গঠিত স্বরাজে অধিকারের কথা জনসাধারণের না জানলেও চলবে; কিন্তু নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাদের জানা দরকার। এমন কোন কর্ত্তব্য নেই যা প্রতিপালন করার ফলে অধিকার অর্জ্জিত হয় না। আবার খাঁটি অধিকার তাকেই বলা হয়, যা একজনের কর্ত্তব্য সুচারু রূপে সম্পন্ন করার ফলে অর্জ্জিত হয়। সুতরাং নাগরিক অধিকার তাঁরাই পেতে পারেন যাঁরা নিজ রাষ্ট্রের সেবা করেন। আর তাই তাঁরাই শুধু এ ভাবে অর্জ্জিত অধিকারের সদ্ব্যবহার করতে পারেন। মিথ্যাভাষণের বা গুণ্ডামি করার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে। কিন্তু এরকম অধিকার প্রয়োগ করায় প্রয়োগকারী এবং

সমাজ উভয়েরই ক্ষতি। কিন্তু সত্য এবং অহিংসা আচরণকারী সম্মান অর্জ্জন করেন এবং এই সম্মানের ফলে অর্জ্জিত হয় অধিকার। কর্ত্তব্য সম্পাদন করার ফলে যাঁরা অধিকার অর্জ্জন করেন তাঁরা সমাজসেবার জন্যই সে অধিকার প্রয়োগ করেন। নিজের জন্য কদাচ প্রয়োগ করেন না। কোন জাতির স্বরাজের অর্থ হচ্চে ব্যষ্টির স্বরাজের (স্বায়ত্ত-শাসনের) সমষ্টি। আর জনসাধারণ ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকের কর্ত্তব্য পালন করলেই আসে ঐ ধরণের স্বরাজ। এ রকম স্বরাজে কেউ নিজের অধিকারের কথা চিন্তা করে না। সুচারুরূপে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনকালে এসব স্বাভাবিক ভাবে চলে আসে।

অহিংসার ভিত্তিতে স্থাপিত স্বরাজে কারও সঙ্গে কারো শত্রুতা থাকবে না। সর্ব্বসাধারণের কাম্য আদর্শে উপনীত হবার জন্য প্রত্যেকে যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করবে। প্রত্যেকে লেখাপড়া জানবে এবং প্রতিনিয়ত তাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। রোগ এবং অসুস্থতার প্রসার যথাসম্ভব কমাতে হবে। নিঃস্ব কেউ থাকবে না এবং শ্রমিকেরা সব সময়েই কাজ পাবে। জুয়া, পানাসক্তি এবং নৈতিক অধঃপতন বা শ্রেণীবিদ্বেষের স্থান এরকম সরকারের রাজত্বে থাকবে না। বিবেচনা করে প্রয়োজনানুসারে ধনী তার সম্পদ ব্যবহার করবে, নিজের জাঁকজমক বা পার্থিব ভোগবিলাসের জন্য অপব্যয় করবে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনী রত্নখচিত প্রাসাদে বাস করলে এবং লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ আলোহাওয়া-বিবর্জ্জিত পর্ণকুটীরে থাকলে চলবে না। অহিংস স্বরাজে কারও ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং সেই রকম কোন অন্যায্য অধিকারও থাকবে না। সুসংগঠিত রাষ্ট্রে বলপূর্ব্বক কোন কিছু দখল করা সম্ভব হবে না এবং বলপূর্ব্বক দখলকারীকে অধিকারচ্যুত করার জন্য শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন হবে না।

তৃতীয় অধ্যায়

দরিদ্র-নারায়ণ

যে লক্ষ লক্ষ নামে মানুষ নামাতীত এবং মনুষ্যের বোধাতীত ঈশ্বরকে ডাকে তারই একটি হচ্চে 'দরিদ্র-নারায়ণ' এবং এর অর্থ হচ্চে দরিদ্রের ভগবান বা দরিদ্রের হৃদয়ে বিরাজিত ভগবান।

কোটি কোটি মূক জনসাধারণের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের স্থান, তাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমি জানি না। তাঁর অস্তিত্ব তারা বুঝতে না পারলেও আমি পারি।

এই কোটি কোটি জনসাধারণের সেবা দ্বারা আমি সেই সত্যরূপী ভগবান অথবা ভগবানরূপী সত্যের উপাসনা করি।

ভগবানের বাণী তাদের সামনে উপস্থিত করার ধৃষ্টতা আমার নেই। ঐ কোটি কোটি বুভুক্ষু জনসাধারণ, যাদের চক্ষু দীপ্তিহীন এবং অন্নই যাদের কাছে ঈশ্বর, তাদের ভগবানের বাণী শোনানো অরণ্যে রোদনেরই সামিল। কর্ম্মের পবিত্র বাণী তাদের সামনে তুলে ধরলে তবেই ভগবানের বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। সুষ্ঠুভাবে প্রাতরাশ সম্পন্ন করার পর অধিকতর সুষ্ঠু মধ্যাহ্নভোজনের প্রত্যাশায় বসে বসে, আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের কথা আলোচনা করা খুবই মনোরম। কিন্তু দুবেলা যারা পেট ভরে অন্ন পায় না, তাদের কাছে ভগবানের কথা বলব কোন মুখে? তাদের কাছে ঈশ্বর শুধু অন্নবস্ত্রের রূপেই আবির্ভূত হতে পারেন। ভারতীয় কৃষককুল তাদের জমি থেকে অন্ন পায় বটে তবে বস্ত্রের অভাব পূরণ করার জন্যে তাদের আমি চরখা দিয়েছি। আর আমি সেই অর্দ্ধাহারী, অর্দ্ধনগ্ন কোটি কোটি জনতার একমাত্র প্রতিনিধি বলেই আজ কৌপীন পরে ঘুরে বেড়াই।

এই দুঃখপ্রদ দারিদ্র্য থেকে ভারত নিজেকে মুক্ত করে স্বাধীনতার দ্বারদেশে উপনীত হবে, এবং তার নবজাগরণ হবে, এই বিশ্বাস আছে বলে আমি অনশনে আত্মত্যাগ করার থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পেরেছি। এই রকম সম্ভাবনায় আস্থা না থাকলে আমার বাঁচার আগ্রহ থাকবে না।

দরিদ্রের কাছে মিতব্যয়িতাই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা। ঐ সব বুভুক্ষু জনসাধারণের মনে আপনি আর কোন রকমেই সাড়া জাগাতে পারবেন না। এ সব তাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হবে না। কিন্তু আপনি তাদের কাছে খাদ্য নিয়ে যান, আপনাকে তারা দেবতা মনে করবে। অন্য কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা তাদের নেই।

তাদের জীর্ণবস্ত্রপ্রান্তে শক্ত করে বাঁধা মলিন টাকাপয়সা এই হাতে আমি সংগ্রহ করেছি। আধুনিক প্রগতির কথা তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখুন। ভগবানের কথা তাদের কাছে বললে তারা আমাকে এবং আপনাকে পাষণ্ড আখ্যা দেবে। ঈশ্বরকে যদি তারা আদৌ চিনে থাকে তবে তারা তাঁকে এক আতঙ্কজনক, প্রতিহিংসাপরায়ণ, এবং নিষ্ঠুর অত্যাচারী শক্তি বলেই জানে।

আমার বিবেচনায় আমরা প্রত্যেকেই এক এক ধরণের তস্কর। এখনই আমার যা দরকার নয়, এমন কিছু নিয়ে রেখে দিলে, সেটা অপর কারও কাছ থেকে চুরি করা হয়। প্রকৃতির একটি মৌলিক নীতি হচ্ছে এই যে, প্রকৃতি নির্ব্বিচারে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন করে, এবং প্রত্যেকে যদি নিজের প্রয়োজনটুকু মেটায়, আর তার বেশী কিছুই গ্রহণ না করে, তবে দুনিয়ায় দারিদ্র্য থাকবে না, এবং অনশনে কারও জীবন যাবে না।

ভারতে এমন বহুলোক আছে, যাদের একবেলা আহার করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়, এবং স্নেহময় পদার্থের সম্পর্ক বিহীন একটু নুনের সহযোগে

একটি চাপাটী মাত্র হয় সেই একবেলার আহার। এই কোটি কোটি জন-সাধারণ খেতে পরতে না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনার বা আমার আজ যা আছে তাতে কোন অধিকার নেই'। আপনার বা আমার জানা উচিত যে এর ভিত্তিতে আমাদের প্রয়োজনকে সীমিত করা দরকার। এবং তারা যাতে খেতে পরতে পারে ও তাদের যত্ন হয় তার জন্য এমনকি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে আমাদের ক্লেশ বরণ করা দরকার।

যে ঐশ্বরিক বিধানের ফলে মানুষ, বেশী নয়, শুধু তার প্রাত্যহিক খাদ্য পায়, সে সম্বন্ধে আমরা হয় অজ্ঞ আর নয় অনবহিত বলে যাবতীয় অসাম্য ও তৎসংশ্লিষ্ট দুঃখের সৃষ্টি হয়। লক্ষ লক্ষ লোক যখন অনশনে কাটায় এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন ধনিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনাতিরিক্ত অত্যধিক সম্পদ থাকার দরুণ অবহেলাভরে সেগুলির অপচয় হয়। মাত্র নিজের যেটুকু প্রয়োজন, তা যদি সবাই রাখে, তাহলে কারও আর অভাব থাকে না এবং সবাই পরিতুষ্ট হয়।

একজনও সুস্থ কার্য্যক্ষম নরনারী যতক্ষণ বেকার থাকবে বা অনশনে দিন যাপন করবে ততক্ষণ আরাম করতে বা পূর্ণ আহার গ্রহণ করতে আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

সেরা নিয়ম হচ্ছে,······লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ যা পায় না, দৃঢ় ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করা। প্রত্যাখ্যান করার এই যোগ্যতা হঠাৎ আমাদের মধ্যে আসবে না। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের অধিকারে যা নেই, তার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ না করার মত মনোবৃত্তি গড়ে তোলাই হচ্ছে প্রথম কাজ; এবং তার পরবর্ত্তী কাজ হচ্ছে যথাসম্ভব দ্রুত গতিতে আমাদের জীবনযাত্রাপ্রণালীকে এমন ভাবে পুনর্গঠিত করা, যা সেই মনোবৃত্তির সাথে মানিয়ে চলতে পারে।

যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, কবির, নানক, চৈতন্য, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি সহস্র সহস্র জনসাধারণের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং তাদের চরিত্র গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের আবির্ভাবে জগৎ ধন্য হয়েছে। এঁরা আবার সকলেই দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

নিজের প্রতিবেশীর যিনি সেবা করেন, তাঁর হৃদয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ঈশ্বর আসন গ্রহণ করেন। আবু-বিন-আধেম ছিলেন এই রকম। তাঁর প্রতিবেশীর সেবা করতেন বলে ঈশ্বরসেবীর নামের তালিকায় সর্ব্ব প্রথমে ছিল তাঁর নাম।

কিন্তু অত্যাচারিত এবং শোকপীড়িত কারা?—যারা দারিদ্র্যজর্জ্জর এবং দলিত। সুতরাং ভক্ত যিনি হবেন, তাঁকে কায়মনোবাক্যে এদের সেবা করতে হবে। দারিদ্র্যের জন্য চরখা কাটার শারীরিক শ্রমটুকু পর্য্যন্ত যাঁরা স্বীকার করতে চান না, এবং বাজে অজুহাত দেখান, তাঁরা সেবার অর্থ জানেন না। দরিদ্রের সামনে যিনি সুতো কেটে তাদেরও অনুরূপ কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করেন, তিনি যে-কোন লোকের অপেক্ষা অধিক মাত্রায় ঈশ্বরসেবা করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাতে ভগবান বলেছেন, ভক্তি করে কেউ সামান্য ফল, পুষ্প বা এমন কি পত্রও যদি আমাকে অর্পণ করে তো সে আমার সেবক।

দীন হীন এবং নিঃস্ব যেখানে বাস করে, সেইখানেই তাঁর পীঠস্থান। সেই জন্য সুতো কাটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা, সেরা উপাসনা এবং চরমতম আত্মত্যাগ।

অন্তত কিছুমাত্রায় নিজেকে বুভুক্ষু জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম করার সহজতম এবং শ্রেষ্ঠতম উপায় হচ্ছে আমার নির্দ্দেশিত তিনটি পন্থায় চরখার বাণী প্রচার করা। সুনিপুণ কাটুনী হয়ে, খদ্দর পরিধান করে, অথবা আর্থিক সহায়তা দ্বারা আপনি চরখার বাণী প্রচার করতে পারেন

আইনজীবী বা চিকিৎসকের বিচ্ছিন্ন ভাবে সুতো কাটা বা কাপড় বোনা এবং নাপিত বা দর্জির দেশসেবা করাই যথেষ্ট নয়। কারিগর, কৃষাণ নির্বিবশেষে নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বনকারী সহস্র সহস্র জনসাধারণের যোগ্যতা সহকারে দেশসেবা করা উচিত। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় শ্রমের মর্য্যাদা বুঝবেন, শ্রমজীবীরা শিক্ষার মর্য্যাদা করবেন, এবং সকলে সমবেত হয়ে এমন ভাবে কাজ করে যাবেন, যাতে জাতি সমৃদ্ধিশালী হয়। জাতির পক্ষে অপমানজনক কিছু করা থেকে তাঁরা বিরত থাকবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গঠনমূলক কার্য্যক্রম

(১) হিন্দু-মুসলমান অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ঐক্য, (২) অস্পৃশ্যতা নিবারণ, (৩) মাদক বর্জ্জন, (৪) খাদি, (৫) অন্যান্য কুটিরশিল্প, (৬) গ্রাম্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, (৭) নয়ি তালিম বা বনিয়াদী শিক্ষা, (৮) বয়স্কদের শিক্ষা, (৯) নারীজাতির উন্নতি, (১০) স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শিক্ষা, (১১) রাষ্ট্রভাষা প্রচার, (১২) মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, (১৩) অর্থনৈতিক সাম্যের জন্যে প্রচেষ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন কয়েক দফা কাজ সমন্বিত গঠনমূলক কার্য্যক্রম এক বিরাট কর্ম্ম-সূচি। প্রয়োজন হলে এই তালিকায় আরও কিছু যোগ করা যেতে পারে, তবে এর ক্ষেত্র এত ব্যাপক যে গঠনমূলক কার্য্যক্রমের অন্যান্য যে বিষয়গুলি এর থেকে বাদ পড়েচে বলে মনে হয়, সেগুলিও এর আওতাতে এসে পড়ে বলেই আমার ধারণা। পাঠক দেখতে পাবেন যে এই সবের অভাবই আমাদের দাসত্বের কারণ।

বিভিন্ন দফাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। হিন্দু-মুসলিম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনা আমরা চিরকাল পঙ্গু হয়ে রয়ে যাব। পঙ্গু ভারত স্বরাজ অর্জ্জন করবে কেমন করে? সাম্প্রদায়িক ঐক্যের অর্থ হিন্দু, শিখ, মুসলিম, খৃষ্টান, পার্শি, ইহুদি ইত্যাদির মধ্যে একতা। এই সকলের সমন্বয়ে হিন্দুস্থান। এর যে-কোন একটি সম্প্রদায়কে যিনি অবহেলা করেন, গঠনমূলক কার্য্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান নেই।

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ যতদিন হিন্দুর মনকে কলুষিত করে রাখবে, ততদিন দুনিয়ার চক্ষে সে অস্পৃশ্য হয়েই থেকে যাবে, এবং যে অস্পৃশ্য,

অহিংস স্বরাজ সে অর্জ্জন করতে পারে না। তথা-কথিত অস্পৃশ্যের সঙ্গে নিজের স্বজনের মত আচরণ করাই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অর্থ। এইরূপ আচরণকারীকে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ভুলতে হবে। বস্তুত তাকে হতে হবে সর্ব্বপ্রকার অন্যায় শ্রেণীবৈষম্য থেকে মুক্ত। সমস্ত দুনিয়াকে তিনি একপরিবারভুক্ত বলে বিবেচনা করবেন। অহিংস স্বরাজ-ব্যবস্থায় কোন দেশকে শত্রু-রাষ্ট্র বলে মনে করা সম্ভব নয়।

উত্তেজক সুরা ইত্যাদি পানীয়ের যারা দাস, তাদের দ্বারা পূর্ণ স্বরাজ অর্জ্জিত হওয়া অসম্ভব। নেশার অধীন ব্যক্তি যে সাধারণত নৈতিক-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত হয়, একথা ভুললে চলবে না।

আমাদের লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু জনসাধারণের সমস্যার কোন ন্যায়সঙ্গত এবং দ্রুত সমাধান যে খাদি ছাড়া হতে পারে না, একথা আজকাল প্রায় সকলেই বিশ্বাস করেন। সুতরাং আমি আর এর বিস্তারিত আলোচনা করব না। এর সঙ্গে আমি শুধু এইটুকুই যোগ করতে চাই যে, খাদির পুনরুদ্ধারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত গ্রাম্য কারিগররা পুনরুজ্জীবিত হবে। খাদির সরঞ্জাম সমূহ (চাকা, তাঁত ইত্যাদি) গ্রাম্য সূত্রধর এবং কর্ম্মকার দ্বারা তৈরী করতে হবে। এই সব সরঞ্জাম গ্রামে তৈরী না হ'লে গ্রাম স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং বর্দ্ধিষ্ণু হ'তে পারবে না। খাদির পুনরুদ্ধারে অন্যান্য কুটির-শিল্পের পুনরুদ্ধারের সূচনা হবে। সূর্য্য বিনা যেমন জগৎ অন্ধকার, তেমনই অন্যান্য আকাশচারী গ্রহ উপগ্রহ ছাড়া সূর্য্যও নিষ্প্রভ। বিশ্ব-জগতের যাবতীয় জিনিষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। গ্রামোদ্ধার ছাড়া ভারতের মুক্তি অসম্ভব।

গ্রামোদ্ধারের ভিতর যদি গ্রামের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার পরিকল্পনা না থাকে, তবে গ্রামগুলি বর্ত্তমানের গোময়-স্তূপের মত হয়েই রয়ে যাবে।

সাফাই গ্রাম্য জীবনের এক অপরিহার্য্য অঙ্গ; এবং এ কাজ যত গুরুত্বপূর্ণ আবার ততই দুরূহ। আবহমানকাল-প্রচলিত অপরিচ্ছন্নতাকে বর্জ্জন করতে হ'লে অসমসাহসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। যে গ্রাম-সেবকের গ্রাম্য সাফাই বিজ্ঞান জানা নেই বা যে প্রথম শ্রেণীর আবর্জ্জনা-পরিষ্কারক নয়, গ্রাম-সেবার সে উপযুক্ত নয়।

লোকে বোধ হয় মোটামুটি মেনে নিয়েচেন যে, নয়ি তালিম বা বনিয়াদী শিক্ষা বিনা ভারতের লক্ষ লক্ষ শিশুদের শিক্ষা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। গ্রাম-সেবককে তাই এটি শিখতে হবে এবং নিজেকে বনিয়াদী-শিক্ষা-নিকেতনের শিক্ষকতার কাজ করতে হবে।

বয়স্কদের শিক্ষা স্বভাবতই বনিয়াদী শিক্ষাকে অনুসরণ করবে। এই নব শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে দৃঢ়মূল হয়নি, শিশুরাই সেখানে নিজের পিতা-মাতার শিক্ষকতা করবে। তা হলেও অবশ্য গ্রাম-সেবককে বয়স্কদের শিক্ষার ভার নিতে হবে।

নারীকে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী বলে বর্ণনা করা হয়। আইন যতদিন পর্য্যন্ত না নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেবে, মেয়ের জন্ম যতদিন পর্য্যন্ত না ছেলের জন্মের সমানই আদৃত হবে, ততদিন পর্য্যন্ত জানতে হবে, ভারত আংশিক পক্ষাঘাতে ভুগচে। নারীর প্রতি অবিচার অহিংসা-নীতিকে অস্বীকার করারই নামান্তর মাত্র। প্রত্যেক গ্রামসেবকই প্রত্যেক নারীকে মাতা, ভগিনী অথবা কন্যার মত দেখবে এবং তাদের যথোচিত সম্মান দেবে। এই রকম কর্ম্মীই গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জ্জন করতে সক্ষম হবে।

অসুস্থ লোকের পক্ষে স্বরাজ অর্জ্জন করা অসম্ভব। সুতরাং দেশবাসীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আর অবহেলা করা অনুচিত। স্বাস্থ্যের মূলনীতিগুলি প্রত্যেক গ্রামসেবকের জানা দরকার।

একটি সাধারণ ভাষা ছাড়া কোন জাতি টিকতে পারে না। হিন্দুস্থানী হিন্দি এবং উর্দ্দু এই বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে হিন্দু মুসলমান দুইই যে ভাষা বুঝতে পারে, সেই রাষ্ট্রভাষার জ্ঞান গ্রাম-সেবকের অর্জ্জন করা দরকার।

ইংরেজীর প্রতি মোহের জন্য আমরা প্রাদেশিক ভাষা সমূহের প্রতি আস্থা হারিয়েছি। অন্তত এই অবিশ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গ্রামসেবক গ্রামবাসীদের ভিতর নিজ ভাষার প্রচার করবেন। ভারতের অন্যান্য ভাষার প্রতি তাঁর সমপরিমাণ শ্রদ্ধা থাকবে এবং তাঁর কর্ম্মক্ষেত্রের স্থানীয় ভাষা তিনি শিখে নেবেন এবং এইভাবে তত্রত্য গ্রামবাসীদের নিজ ভাষা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল করে তুলবেন।

অর্থনৈতিক সাম্যের দৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এ সমস্ত কার্য্যক্রমই বালুচরে বাসা বাঁধার মত হবে। অর্থনৈতিক সাম্যের অর্থ এই নয় যে, পার্থিব ভোগসামগ্রী সকলেরই সমপরিমাণে থাকবে। বাসের জন্য উপযুক্ত গৃহ, স্বাস্থ্যকর যথেষ্ট খাদ্য, এবং শরীর আচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদি অবশ্যই এরকম সামাজিক ব্যবস্থায় প্রত্যেকের পাওয়া দরকার, এবং এর আর একটি অর্থ হচ্ছে এই যে, আজকের এই নিষ্ঠুর অসাম্য খাঁটি অহিংস উপায়ে বিদূরিত হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

গ্রামে ফিরে যাও

আমার বিশ্বাস যে ভারতকে খুঁজে পাওয়া যাবে তার সাতলক্ষ গ্রামে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি সহরে নয়। অসংখ্যবার আমি এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছি। কিন্তু সহরবাসী আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতের সত্তা আছে তার সহরগুলিতে এবং গ্রামগুলির সৃষ্টি হয়েচে আমাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। ঐ হতভাগ্যের দল যথেষ্ট খাদ্য এবং পরিধেয় পায় কিনা এবং রৌদ্রতাপ বা বৃষ্টির থেকে আত্মরক্ষা করার উপযুক্ত বাসগৃহ তাদের আছে কিনা, এ কথা ভুলেও আমরা কখনও জিজ্ঞাসা করি না।

আমি দেখেছি, সহরবাসীরা সাধারণত গ্রামবাসীদের শোষণ করে এবং কার্য্যত হতভাগ্য গ্রামবাসীদের জীবিকার উপর তারা নির্ভর করে। ভারতবর্ষের জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে বহু ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী বহু কিছু লিখেছেন। আমার জ্ঞানত কেউ একথা বলেননি যে, কায়ক্লেশে জীবন ধারণোপযোগী সংস্থান তাদের আছে, বরং তাঁরা একথা স্বীকার করেচেন যে, জনসাধারণের এক বিরাট অংশ প্রায় অনশনেই কালাতিপাত করে, শতকরা দশজন অর্দ্ধাহারী এবং বহু লক্ষ লোককে সামান্য একটু লবণ এবং লঙ্কা সহযোগে কিছু ভাত বা অপর কোন শুষ্ক বা দগ্ধ খাদ্যতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

ঐ খাদ্যের উপর নির্ভর করে যদি আমাদের কাউকে থাকতে হয়, তবে আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন যে, হয় এক মাসের বেশী কেউ টিকতে পারব না, আর নয় মানসিক ধীশক্তি হারাবার ভয়ে আমরা শীঘ্রই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে

উঠব। এ সত্ত্বেও আমাদের গ্রামবাসীরা এই অবস্থায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করে।

দেশবাসীর শতকরা পঁচাত্তর ভাগেরও উপর কৃষিজীবী। তাদের শ্রমের প্রায় যাবতীয় ফল যদি আমরা তাদের কাছ থেকে নিয়ে নিই বা অপরকে নিতে দিই, তবে আমাদের স্বায়ত্ত শাসনের কোনই অর্থ হয় না।

গ্রামবাসীদের প্রতি ঘোর অপরাধে আমরা অপরাধী। এর প্রায়শ্চিত্তের একমাত্র উপায় হচ্চে তাদের লুপ্ত শিল্প-ব্যবসায়গুলির পুনরুদ্ধারে তাদের সহায়তা করা এবং তাদের তৈরী মালের জন্য বাজার সৃষ্টি করে দেওয়া।

তাদের দেখাতে হবে যে, সামান্য খরচে তারা তাদের শাক-সব্জী উৎপন্ন করতে পারে এবং এই ভাবে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। এও আমাদের দেখাতে হবে যে, কাঁচা শাক-সব্জী রাঁধলে তার খাদ্যপ্রাণের অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়।

শুধু লিখতে পড়তে এবং হিসাব রাখতে জানলেই তাদের চলবে না। নিজেদের অর্থ নৈতিক জীবনের অবস্থা এবং তার উন্নতির উপায় সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান দিতে হবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অচেতন ও কর্ম্মের আনন্দের অনুভূতি বিহীন অবস্থায় তারা আজ স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত কাজ করে চলেচে।

কেমন করে সময় স্বাস্থ্য এবং অর্থ বাঁচাতে হয়, এ তাদের শেখাতে হবে। লিওনেল কার্টিস আমাদের গ্রামগুলিকে গোময়স্তূপ বলে বর্ণনা করেচেন। এগুলিকে আদর্শ গ্রামে পরিণত করতে হবে। মুক্ত বায়ুর মধ্যে বসবাস করা সত্ত্বেও আমাদের গ্রামবাসীরা বিশুদ্ধ বায়ু পায় না। সবচেয়ে টাটকা খাদ্যের মধ্যে থেকেও তারা নিজেরা টাটকা খাবার পায় না। খাদ্যের বিষয়ে আমি বিশেষ জোর দিচ্ছি, কারণ গ্রামকে সৌন্দর্য্যের আকরে রূপান্তরিত করা আমার লক্ষ্য।

কুটির-শিল্পের পুনরুদ্ধার খাদি-পরিকল্পনাকেই ব্যাপকতর করা মাত্র। হাতে কাটা সুতো, হাতে তৈরী কাগজ, ঢেঁকি-ছাঁটা চাল, ঘরে তৈরী রুটী ও আচার ইত্যাদি পাশ্চাত্য দেশসমূহেও নূতন নয়। শুধু এর গুরুত্ব ভারতে যতখানি তার শতাংশের একাংশও সেখানে নেই। আমাদের কাছে এর পুনরুদ্ধার হ'ল গ্রামের পুনরুজ্জীবন এবং এর ধ্বংসের অর্থ হ'ল গ্রামবাসীর মৃত্যু।

গ্রামের প্রত্যেক কুটিরে যদি বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্য পাওয়া সম্ভব হয় এবং সেই বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায় গ্রামবাসীরা যদি তাদের যন্ত্রপাতি চালায় তবে আমার তাতে আপত্তির কিছু নেই। তবে সে অবস্থায় গ্রাম্য গোচারণ ভূমির মতই সেই সব বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্রগুলি থাকবে গ্রামবাসীর আর নয় সরকারের হাতে। বৈদ্যুতিক শক্তি বা যন্ত্রপাতি যেখানে নেই সেখানকার বেকাররা করবে কি?

শিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত ব্যক্তিরা বহুদিন যাবৎ গ্রামবাসীদের অবহেলা করে এসেছেন। তাঁরা সহরের জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছেন। সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ কর্ম্মীদের গ্রামসেবা মারফত আত্মবিকাশের সুযোগ দিয়ে গ্রামের সাথে স্বাভাবিক সংযোগ স্থাপনা করাই গ্রামোদ্যোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

গ্রাম্য সমাজের পুনরুদ্ধার করতে হবে। ভারতের নগর সমূহের প্রয়োজনীয় বস্তুসামগ্রী গ্রামে উৎপন্ন হয়ে সহরে চালান আসত। সহরগুলি বিদেশী মালের বাজারে পরিণত হওয়ায় এবং সস্তা ও খেলো বিদেশী মাল বাজারে স্তূপীকৃত করে গ্রামগুলিতে অর্থাগমের রাস্তা বন্ধ করায় ভারত দারিদ্র্যদশায় পতিত হ'ল।

স্বার্থপরের মত গ্রামগুলিকে শোষণ না করে, গ্রাম থেকে যে শক্তি এবং উপজীবিকা তারা পায়, তার বিনিময়ে উপযুক্ত প্রতিদান দেওয়া তাদের কর্ত্তব্য বলে যখন সহরগুলি বুঝতে পারবে, তখনই এই দুই-এর মধ্যে এক

স্বাস্থ্যকর নৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে। এই বিরাট এবং মহৎ সমাজসংস্কারের কাজে সহরের ছেলেরা যদি যথোপযুক্ত অংশ গ্রহণ করতে চায় তবে তাদের শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে গ্রামের প্রয়োজনীয়তার প্রত্যক্ষ সংস্রব থাকা দরকার।

গ্রামে ফেরার আন্দোলনে গ্রামবাসী এবং নগরবাসী এই দুই-এরই সমান শিক্ষণীয় বিষয় আছে। সহর থেকে যে সব কর্ম্মী আসবেন, তাঁদের গ্রামীন মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে; এবং গ্রামবাসীর মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে হবে। এর অর্থ এ নয় যে, গ্রামবাসীর মত অনশনে কালাতিপাত করতে হবে। তবে পুরাতন জীবনযাত্রাপ্রণালীর যে আমূল পরিবর্ত্তন করতে হবে তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রামবাসীর ধারণা অদ্ভুত রকমের, বা কোন্ খাদ্য কখন্ কিভাবে খেতে হয় সে সম্বন্ধে যারা আদৌ চিন্তা করে না, আমরা তাদের মত হব না। আমাদের হতে হবে আদর্শ গ্রামবাসী। তাদের বেশীর ভাগই যেমন যে-কোন রকমে রাঁধে, খায় বা থাকে, আমাদের তেমন হলে চলবে না। আদর্শ খাদ্য কী তাদের দেখাব। শুধু পছন্দ অপছন্দের কথা বললে আমাদের চলবে না। ঐ সব পছন্দ অপছন্দের মূল অনুসন্ধান করে দেখাতে হবে।

তারা যে ডোবায় স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে এবং যেখানে তাদের গৃহ-পালিত পশুগুলি স্নান করে আর জল খায়, সেই ডোবার জল আমরা কেমন ভাবে পান করব, এ যারা দেখতে চায়, এবং আনত পৃষ্ঠে খর রৌদ্রের মধ্যে যারা খেটে চলে, সেই সব গ্রামবাসীদের সঙ্গে আমাদের একাত্ম হ'তে হবে। তখনই আমরা সত্য সত্যই জনগণের প্রতিনিধিত্ব করব, তার আগে নয়। আর, আমার এই লেখাটা যেমন সত্য, তারাও যে আমাদের সমস্ত ডাকে সাড়া দেবে একথাও তেমনি সত্য।

খাদ্য-তালিকার সংস্কার মারফৎ গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থার পুনর্গঠনের কাজ সুরু হয়েচে বলে গ্রামবাসীরা যাতে হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের উপযোগী সস্তা অথচ সাদাসিধে খাবার পায় তার উপায় করা আবশ্যক। গ্রামবাসীদের খাদ্যতালিকায় কাঁচা শাকসব্জী থাকলে, আজ যে সমস্ত রোগে তারা ভোগে তার অনেকগুলি থেকেই তারা রেহাই পেতে পারে। গ্রামবাসীদের খাদ্যে খাদ্য-প্রাণের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয় এবং কাঁচা সাকসব্জী দ্বারা এর অনেকখানিই পূরিত হতে পারে। কাঁচা শাকসব্জীর উপযুক্ত ব্যবহার হ'লে খাদ্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণায় বিপ্লব সৃষ্টি হবে এবং আজ দুধের যা কাজ তার অনেকখানিই কাঁচা শাকসব্জীতে হ'তে পারে।

সহরগুলি নিজেরাই নিজেদের দেখাশোনা করতে পারে। গ্রামের প্রতিই আমাদের নজর দিতে হবে। কুসংস্কার, গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাদের উদ্ধার করতে হবে। তাদের সঙ্গে বাস করে, তাদের সুখদুঃখের ভাগ নিয়ে, তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করে ও জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে এ সব আমরা করতে সমর্থ হব।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রত্যেক গ্রামে এক একটি সাধারণ তন্ত্র

একেবারে গোড়া থেকে স্বাধীনতা আরম্ভ করতে হবে। এই জন্যে প্রত্যেক গ্রামকে হয় একটি সাধারণতন্ত্রে পরিণত করতে হবে, আর নয় পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন এক একটি পঞ্চায়েৎ সেখানে স্থাপনা করতে হবে। সুতরাং স্বভাবতই প্রত্যেক গ্রাম আত্ম-নির্ভরশীল হবে এবং এমন কি সমস্ত দুনিয়ার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করবে। কোন বহিঃশক্তির আক্রমণের সামনে আত্মরক্ষা করতে এবং প্রয়োজন হলে সেই প্রচেষ্টায় আত্মত্যাগ করতে তাকে শিখতে হবে। এই ভাবে শেষ পর্য্যন্ত একক ভাবে প্রতিটি ব্যক্তিই হচ্চে এর অন্তিম লক্ষ্য। এতে অবশ্য প্রতিবেশী বা সমগ্র জগতের উপর নির্ভরশীল হতে বা তাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য নিতে কোন মানা নেই। পারস্পরিক শক্তির এ হবে স্বাধীন এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আদান-প্রদান। স্বভাবতই ঐ রকম সমাজ হবে যথেষ্ট সংস্কৃতিসম্পন্ন এবং এই সমাজের প্রত্যেক নরনারী শুধু তাদের প্রয়োজনের কথাই জানবে না, সমপরিমাণ শ্রম দ্বারা অপরে যা পায় না, তা কারও পাওয়া উচিত নয় একথাও তাদের জানা থাকবে।

স্বভাবত এই সমাজ সত্য এবং অহিংসার ভিত্তিতে রচিত হবে। ঈশ্বরে স্থির বিশ্বাস না থাকলে এ আবার সম্ভব নয়। আবহমানকাল বিরাজিত, সর্ব্বজ্ঞ, জীবন্ত এক শক্তি হচ্চে ঈশ্বরের অর্থ। এর সঙ্গে দুনিয়ার অন্যান্য যাবতীয় শক্তি দৃঢ়সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও কারও উপর এ নির্ভরশীল নয়, এবং অন্যান্য যাবতীয় শক্তি যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত বা অকার্য্যকারী হয়ে যাবে তখনও এর

অস্তিত্ব থাকবে। ঐ জীবন্ত আলোকরশ্মিতে বিশ্বাস ছাড়া আমার কার্য্যকলাপের কোন সদুত্তর দিতে আমি অপারগ।

অসংখ্য গ্রাম দ্বারা নির্ম্মিত এই কাঠামো, নিয়ত পরিবর্দ্ধনশীল গ্রামগোষ্ঠী নিয়ে রচিত হবে। জীবন এখানে পিরামিডের মত হবে না, যার চূড়া দাঁড়িয়ে থাকে তলদেশের শক্তিতে। এ হবে এক সামুদ্রিক বেষ্টনীর মত, যার কেন্দ্র হবে প্রত্যেকটি ব্যক্তি। এই সব ব্যক্তি গ্রামের জন্য, এবং এই গ্রামগুলি গ্রামগোষ্ঠীর জন্য আত্মত্যাগে সদাই প্রস্তুত থাকবে। ব্যক্তিসমষ্টি দ্বারা গঠিত এই কাঠামো এইভাবে শেষে একটিমাত্র সত্তায় পরিণত হবে। উদ্ধত হয়ে এরা কখনও অপরের উপর চড়াও হবে না বরং মহাসাগররূপ গ্রামগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হওয়ায় সদাই তারা হবে বিনয়ী।

সুতরাং সর্ব্ববহিঃস্থ বেষ্টনীরেখা, অভ্যন্তরীণ বেষ্টনীকে চূর্ণ করার জন্য তার শক্তি প্রয়োগ করবে না, বরং ভিতরের মণ্ডলীগুলিতে শক্তি সঞ্চার করবে এবং নিজে কেন্দ্র থেকে শক্তি পাবে। এ সব আকাশকুসুম এবং চিন্তার অযোগ্য বিষয় বলে আমাকে হয়ত বিদ্রূপ করা যেতে পারে। মনুষ্যকর্ত্তৃক অঙ্কিত হওয়া সম্ভব না হলেও ইউক্লিড-বর্ণিত বিন্দুর যেমন চিরস্থায়ী মূল্য আছে, তেমনি মনুষ্যজাতির অস্তিত্বের জন্যই আমার বর্ণিত চিত্রেরও স্বকীয় মূল্য বর্ত্তমান। পরিপূর্ণরূপে অনুসরণে সমর্থ না হলেও ভারত যেন এই বাস্তব চিত্রানুযায়ী নিজ জীবন পরিচালিত করে। আদর্শের কাছে পৌছানোর জন্য প্রযত্ন করার আগে আদর্শ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক্ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতের গ্রামসমূহে কোনদিন যদি এক একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে আমার আলেখ্যকেই আমি যথার্থ বলে দাবী করব; কারণ আমার পরিকল্পিত সর্ব্বশেষেরটি হবে সর্ব্বপ্রথমের সমান, অর্থাৎ এক কথায় এতে বড় ছোটর বাছবিচার থাকবে না।

এই আলেখ্যে প্রত্যেক ধর্ম্মেরই সমান এবং যথাযোগ্য স্থান আছে। আমরা সবাই হচ্ছি এক বিশাল মহীরুহের পত্রগুচ্ছ, যার শিকড় চলে গেছে ভূমির বহুনিম্নে এবং এর কাণ্ডকে এখন আর নাড়া দিয়ে শিকড় থেকে বিচ্যুত করা যায় না। প্রবল বাত্যাও এখন আর এ'কে নড়াতে পারে না।

যে যন্ত্রের দ্বারা মানুষের শ্রমশক্তি বেকার হয়, এবং মুষ্টিমেয় জনকয়েকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়, তার স্থান এখানে নেই। সংস্কৃতিসম্পন্ন মানব-জীবনে শ্রমের মর্য্যাদা অতুলনীয়। যে সব যন্ত্র প্রত্যেকের সহায়তা করে, তার যথাযোগ্য স্থান আছে। তবে একথা স্বীকার করতে আমি বাধ্য যে যন্ত্রের ভবিষ্যৎ কি হতে পারে সে সম্বন্ধে আমি চিন্তা করিনি। সিঙ্গারের শেলাই কল সম্বন্ধে আমি চিন্তা করেচি। তবে তাও বিশেষ মনোযোগ সহকারে নয়। আমার চিত্র সম্পূর্ণ করতে এরও প্রয়োজনীয়তা নেই। অত্যাবশ্যক প্রয়োজন সমূহ মেটানোর জন্য প্রতিবেশীর উপর নির্ভরশীল না হয়ে, আবার দরকারী বহুবিষয়ে পরস্পর নির্ভরশীল, স্বাধীন গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রই হচ্চে গ্রাম্য স্বরাজের অর্থ। সুতরাং প্রত্যেক গ্রামের প্রাথমিক কর্ত্তব্য হবে নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য এবং বস্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় তূলার উৎপাদন করা। গোচারণভূমি এবং শিশু ও যুবকদের জন্য খেলার মাঠ ইত্যাদি এখানে থাকবে। এর অতিরিক্ত জমি থাকলে গাঁজা, তামাক, আফিং ইত্যাদির চাষ না করে কোন প্রয়োজনীয় অর্থকরী ফসল উৎপন্ন করতে হবে।

গ্রামের নিজস্ব নাট্যশালা, বিদ্যালয় এবং সাধারণ সভাগৃহ থাকবে। বিশুদ্ধ জলের জন্য গ্রামের স্বকীয় জলসরবরাহ ব্যবস্থা থাকবে। নিয়ন্ত্রিত কূপ বা পুষ্করিণী দ্বারা এ করা সম্ভব। বনিয়াদী শিক্ষার সর্ব্বোচ্চ মান পর্য্যন্ত শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক। যতদূর সম্ভব যাবতীয় কার্য্যকলাপ সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত করতে হবে। অস্পৃশ্যতামণ্ডিত বর্ত্তমান জাতি-ভেদ প্রথা তখন থাকবে না।

সত্যাগ্রহ এবং অসহযোগের নীতি সমন্বিত অহিংসা গ্রাম্য-সমাজের অনুমোদন লাভ করবে। প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে গ্রামরক্ষী দলে কাজ করতে হবে। গ্রামবাসীদের দ্বারা রচিত একটি তালিকা থেকে পর্য্যায়ক্রমে এদের বেছে নেওয়া হবে, নরনারী নির্ব্বিশেষে ন্যূনতম যোগ্যতা বিশিষ্ট যাবতীয় সাবালকের মতামত দ্বারা বৎসরান্তে নির্ব্বাচিত পাঁচজনের একটি পঞ্চায়েত গ্রামের শাসনকার্য্য চালাবে। এই সমস্ত পঞ্চায়েতের যাবতীয় ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব থাকবে। পরিকল্পিত এই ব্যবস্থায় শাস্তিদান প্রথা না থাকায়, নিজেদের কার্য্যকালের এক বৎসর, এই পঞ্চায়েতগুলি একাধারে ব্যবস্থাপরিষদ, বিচারালয় এবং শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করবে।

বর্ত্তমান অবস্থাতেও যে কোন গ্রাম এই রকম সাধারণতন্ত্রে পরিণত হতে পারে; এবং কর আদায় করা ছাড়া বর্ত্তমানে গ্রামের সঙ্গে সরকারের আর বিশেষ কিছুই সম্বন্ধ না থাকায়, তারাও এতে বিশেষ কিছু হস্তক্ষেপ করতে সমর্থ হবে না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহ বা তাদের যদি কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকে, তার সাথে এর সম্পর্কের বিষয় আমি অবশ্য আলোচনা করিনি, গ্রাম্য-শাসন ব্যবস্থার একটি মোটামুটি ধারণা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ভিত্তিতে রচিত আসল গণতন্ত্র এখানে দৃষ্টিগোচর হবে। প্রতিটি ব্যক্তিই হচ্চে নিজ শাসন-ব্যবস্থার স্রষ্টা। অহিংসানীতি তাকে এবং তার শাসনব্যবস্থাকে পরিচালিত করে। সে এবং তার গ্রাম জগতের সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। প্রত্যেক গ্রামবাসী যেন এই আদর্শে পরিচালিত হয় যে নিজের এবং গ্রামের সম্মান রক্ষার্থে সে প্রয়োজন হ'লে মৃত্যুবরণ করবে।

এ রকম গ্রাম সৃষ্টি করতে হয়ত জীবনব্যাপী প্রচেষ্টার দরকার। গণতন্ত্র এবং গ্রামীন জীবনে অনুরাগী যে কেউ একটি গ্রাম নিয়ে,

সে-টিকেই তাঁর জগৎ এবং একমাত্র কাজ বিবেচনা করে চেষ্টা করে দেখলে সুফল পাবেন। একাধারে তিনি গ্রাম্য ঝাড়ুদার, কাটুনী, চৌকিদার, চিকিৎসক ও শিক্ষকের কাজ করবেন। তাঁর কাছে কেউ যদি না আসে তবে আবর্জ্জনা পরিষ্কার করে এবং সুতো কেটে তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন।

গ্রাম্য প্রদর্শনী

যদি আমরা বিশ্বাস করি এবং চাই যে গ্রামকে শুধু কোন রকমে টিকে থাকলেই চলবে না, তাকে শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী হতে হবে, তবে গ্রামীন দৃষ্টিভঙ্গীই হচ্ছে তার একমাত্র সঠিক পথ। এ কথা সত্য হলে আমাদের প্রদর্শনীগুলিতে সহরের জাঁকজমক বা আড়ম্বরের স্থান নেই, সহরের খেলা-ধুলা বা আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন নেই। প্রদর্শনী যেন "তামাসা" বা অর্থো-পার্জ্জনের পন্থা না হয়ে দাঁড়ায়, ব্যবসায়ীদের পণ্যদ্রব্যের বিজ্ঞাপনের স্থান এ যেন না হয়। কিছুই এখানে বিক্রী করা চলবে না। এমন কি খাদি বা কুটির-শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীও এখানে বিক্রীত হবে না। প্রদর্শনী হবে শিক্ষার বাহন এবং মনোরঞ্জক। প্রদর্শনী দেখে গ্রামবাসীরা যেন কোন একটি শিল্পে আত্ম-নিয়োগে অনুপ্রাণিত হয়। বর্ত্তমান গ্রাম্য জীবনের দোষগুলি এতে স্পষ্টভাবে দেখানো হবে এবং সেগুলি সংশোধনের পন্থাও প্রদর্শিত হবে। গ্রাম-সংস্কারের পরিকল্পনা গ্রহণ করার পর থেকে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এ বিষয়ে যে প্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে, তাও এখানে দেখানোর ব্যবস্থা থাকা দরকার। গ্রাম্য জীবনকে কি করে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করা যায় তাও এখানে শেখানো হবে।

এখন দেখা যাক যে, উপরিউক্ত সর্ত্ত পূরণকারী প্রদর্শনীর রূপ কেমন হওয়া উচিত।—

দু' রকম গ্রামের প্রতিরূপ দেখাতে হবে। একটি হবে বর্ত্তমান এবং অপরটি হবে উন্নততর গ্রামের নমুনা। উন্নততর গ্রামের সর্ব্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন

থাকবে। বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, চতুষ্পার্শ্ব এবং শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি সবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে। গৃহপালিত পশুর অবস্থাও উন্নততর হবে। কোন্ কোন্ শিল্প এবং ব্যবসায়ে অধিকতর রোজগারের সম্ভাবনা আছে—বই, প্রাচীর-পত্র, ছবি ইত্যাদি দ্বারা তা দেখাতে হবে।

কেমন ভাবে বিভিন্ন কুটির-শিল্প পরিচালিত করতে হয়, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কোথায় পাওয়া যায়, এবং কেমন ভাবে সেগুলি বানাতে হয়, তা এখানে দেখাতে হবে, প্রত্যেক শিল্পের প্রত্যক্ষ কার্য্য-পদ্ধতি এখানে প্রদর্শিত হবে। এ ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও এখানে স্থান পাবে।—

(ক) আদর্শ গ্রাম্য খাদ্য।

(খ) কুটীর-শিল্প এবং যন্ত্র-শিল্পের মধ্যে তুলনা।

(গ) পশুপালনের আদর্শ শিক্ষা।

(ঘ) কলাবিভাগ।

(ঙ) গ্রামের আদর্শ পায়খানা।

(চ) কৃষিক্ষেত্রসঞ্জাত সার বনাম রাসায়নিক সার।

(ছ) পশুর চামড়া, হাড় ইত্যাদি কাজে লাগানোর উপায়।

(জ) গ্রাম্য সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র এবং নাটক।

(ঝ) গ্রামের খেলা-ধূলা, আখড়া এবং ব্যায়ামপদ্ধতি।

(ঞ) নয়ি তালিম। (ট) গ্রাম্য ঔষধ। (ঠ) গ্রামের প্রসূতিসদন।

পূর্ব্বপ্রকাশিত নীতির আধারে এই তালিকাকে পরিবর্দ্ধিত করা যেতে পারে। আমি যা দেখিয়েছি সে শুধু উদাহরণ মাত্র। এ'কেই শেষ কথা ভাবলে চলবে না। চরখা এবং অন্যান্য কুটিরশিল্পকে অবধারিত বলে মেনে নেওয়ায় তার আর পৃথক উল্লেখ করলাম না। এগুলিকে বাদ দিয়ে প্রদর্শনী হবে সম্পূর্ণ নিরর্থক।

সপ্তম অধ্যায়

নাগরিক দায়িত্ব

আমি কাশীর বিশ্বনাথ-মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম······এবং এর গলির মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় আমার মনে নিম্নোক্ত চিন্তার উদ্রেক হ'ল। উপর থেকে হঠাৎ যদি কোন আগন্তুক এই বিরাট মন্দিরে এসে পড়ে এবং আমরা হিন্দুরা যে কি রকম সে সম্বন্ধে যদি তাকে চিন্তা করতে হয়, তবে তার পক্ষে আমাদের নিন্দা করা কি অন্যায় হবে? এই বিরাট মন্দির কি আমাদের চরিত্রের প্রতিবিম্ব নয়? হিন্দুর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েই এ কথা আমি বলচি। আমাদের পবিত্র মন্দিরের গলিগুলি কি এত অপরিষ্কার থাকা উচিত? আশে-পাশের বাড়ীগুলি যেমন-তেমন ভাবে তৈরী। গলিগুলি সর্পিল এবং সঙ্কীর্ণ। আমাদের দেবালয়গুলি পর্য্যন্ত যদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং প্রশস্ততার আদর্শ-স্বরূপ না হয়, তবে আমাদের স্বায়ত্তশাসন আর কত ভাল হবে? ইংরেজরা ভারত থেকে চলে যাওয়া মাত্রই কি আমাদের দেবালয়গুলি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং শান্তির আকর হয়ে উঠবে?

প্রত্যেক নগর দু'টি ভাগে বিভক্ত। একটি সেনা-নিবাস অঞ্চল এবং অপরটি আসল সহর। এই সহর নামক অংশ এক পূতিগন্ধময় গহ্বর স্বরূপ। জাতি হিসাবে আমরা সহুরে জীবনে অনভ্যস্ত। সহরে থাকতে হ'লে নিরুদ্বিগ্ন গ্রাম্য জীবনের অনুকরণ করলে চলবে না। উপর থেকে নিষ্ঠীবন পড়ার আশঙ্কা নিয়ে যে বোম্বাই-এর ভারতীয়-অধ্যুষিত অঞ্চলের পথচারীদের চলাফেরা করতে হয়, এ চিন্তা করতেও আমার অস্বস্তি

বোধ হয়। আমি যথেষ্ট রেলভ্রমণ করে থাকি। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী-দের অসুবিধা সমূহ আমি লক্ষ্য করে দেখি। তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য শুধু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি দোষারোপ করলেই চলবে না। পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক নিয়মগুলিও আমরা জানি না। গাড়ীর মেঝেতে যেখানে-সেখানে আমরা থুতু ফেলি এবং কখনও চিন্তাও করি না যে, সময় সময় ঐ মেঝের উপর শোওয়া হয়। মেঝেতে যে কি করচি সে সম্বন্ধে আমরা ভাবি না এবং তার ফল স্বরূপ কামরাটি অবর্ণনীয় আবর্জনা-স্তূপে ভরে ওঠে। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর যাত্রীবর্গ তাঁদের অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্য-শালী ভ্রাতৃবৃন্দকে এড়িয়ে চলেন। এঁদের ভিতর আমাদের ছাত্রসমাজকেও আমি দেখেছি। স্বায়ত্ত-শাসনাভিমুখে আমাদের অগ্রগতির জন্য এই সবের সংশোধন করতেই হবে।

যথোপযুক্ত ভাবে মলমূত্রের উপযোগ করতে পারলে লক্ষ লক্ষ টাকার সার আমরা এর থেকে পেতে পারি এবং বহুবিধ রোগের হাত এড়াতে পারি। আমাদের কু-অভ্যাসের জন্য আমরা আমাদের পবিত্র নদীর তীর অশুচি করে ফেলি এবং মক্ষিকার বংশবৃদ্ধির চমৎকার ব্যবস্থা করে দিই। আমাদের অমার্জ্জনীয় অবহেলার জন্য যে সব মক্ষিকা অনাবৃত মলমূত্রে বসে, এর ফলে, তারাই আবার স্নানের পর আমাদের শরীর কলুষিত করে। এই উৎপাতের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় একটি ছোট কোদালের সাহায্যে। মলমূত্র অনাবৃত রাখা, যেখানে সেখানে নাক ঝাড়া, বা রাস্তায় নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা ইত্যাদি হচ্ছে মানবতা এবং ঈশ্বরের কাছে অপরাধ স্বরূপ। অপরের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করার স্বভাবের অভাবই এর দ্বারা সূচিত হয়। নিজের ময়লা যে ঢাকা দেয় না, জঙ্গলে থাকলেও তার কঠোর সাজা হওয়া উচিত।

নদৈন্দিন যে সমস্ত প্রয়োজনের আমরা সম্মুখীন হই, তা গোপন করার কোন অর্থ হয় না। আমাদের অন্ত্যজ ভ্রাতৃবৃন্দ যে সব গ্রামে বস-বাস করে, শুধু সেগুলিকে পরিষ্কার রাখলেই চলবে না। তারা যুক্তির বাধ্য এবং তাদের বোঝান যায়। এই কথা কি আমাদের বলতে হবে যে, তথাকথিত উচ্চবর্ণ তাদের মত যুক্তির বাধ্য নয় এবং বোঝালেও তাঁরা বোঝেন না? এ কথা কি আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, স্বাস্থ্যরক্ষার যে অত্যাবশ্যক নিয়ম নাগরিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন তা তাঁরা জানেন না? গ্রামে আমরা অবাধে অনেক কিছু করতে পারি; কিন্তু কোনক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করার উপযুক্ত বায়ুহীন জনাকীর্ণ পথে আসা মাত্র আমাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়, এবং এখানে তৎক্ষণাৎ আমাদের অন্য ধরণের নিয়ম পালন করতে হয়। আমরা তা করি কি? ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নগরী সমূহে যে অবস্থা আমরা দেখি, তার দায়িত্বভার পৌরসভাগুলির উপর চাপিয়ে দিয়ে কোন লাভ নেই। আমাদের স্বেচ্ছামূলক সহায়তা ছাড়া, একা পৌরসভার পক্ষে এই সব বিরাট নগরীগুলিতে বর্ত্তমান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মানের উন্নতি সাধন করা অসম্ভব।

আমি অবশ্য পৌরসভাগুলিকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছি না। পৌরসভাতে এখনও বহুকিছু করার আছে বলে আমার মনে হয়। সঙ্ঘবদ্ধ সমাজ-জীবন অর্থাৎ নাগরিক জীবনের সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় হচ্চে বাসিন্দাদের জন্যে পরিষ্কার জলের বন্দোবস্ত করা এবং তাদের বাসস্থানগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।

নিজেকে আমি পৌরজীবনে অনুরাগী বলে বিবেচনা করি। আমার মনে হয় যে, কারও পক্ষে পৌরসভার সদস্য হতে পারা বিশেষ ভাগ্যের কথা।

স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে বা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কেউ যেন পৌরসভার সদস্যপদ গ্রহণ করতে না যান। সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে তাঁরা যেন তাঁদের পবিত্র দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ঝাড়ুদার বলে নিজেদের পরিচয় দিতে তাঁরা যেন গর্ব্ব অনুভব করেন। আমার মাতৃভাষায় পৌরসভাকে বলা হয় "কাচরা পট্টি" যার শব্দগত অর্থ হচ্ছে ঝাড়ু দেবার বিভাগ, এবং সত্যসত্যই পৌরসভা যদি নগরের সাধারণ এবং সামাজিক জীবনের সকল বিভাগে সম্মার্জ্জকের কাজ ক'রে তার মলিনতা দূর না করে, পৌরসভা যদি সাফাইয়ের প্রেরণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হয়, এবং শুধু বাহ্য পরিচ্ছন্নতা নয়, নগরের অভ্যন্তরীণ পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, তবে সে পৌরসভার কোন মূল্য নেই।

কোন পৌরসভা বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানভুক্ত এলাকার যদি আমি করদাতা হতাম, তবে চতুর্গুণ প্রতিদানের সম্ভাবনা না থাকলে নিজে তো অতিরিক্ত কর হিসাবে এক পয়সাও দিতাম না, বরং অপরকেও অনুরূপ কাজে প্ররোচিত করতাম। প্রতিনিধি হিসাবে যাঁরা বিভিন্ন পৌরসভা এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেন, তাঁরা সম্মানের জন্য বা পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মত্ত হবার জন্য সেখানে যান না। তাঁরা যান প্রেমপূর্ণ সেবা দিতে। এ সেবা অর্থের উপর নির্ভর করে না। দেশ আমাদের দরিদ্র। সত্যকার সেবা-ভাব দ্বারা আমাদের পৌরসভার সদস্যবর্গ যদি অনুপ্রাণিত হন, তবে নিজেদের তাঁরা অবৈতনিক ঝাড়ুদার, ভাঙ্গী এবং পথ-নির্ম্মায়কে রূপায়িত করবেন এবং এর জন্য গর্ব্ব অনুভব করবেন। তাঁদের যে সব সহকর্ম্মী কংগ্রেস-প্রার্থী হিসাবে নির্ব্বাচিত হননি, তাঁদেরও তাঁরা একাজে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানাবেন এবং আদর্শে যদি নিজেদের অটুট আস্থা থাকে তবে তাঁদের উদাহরণ তাঁদের ভিতর সাড়া জাগাবে, এর জন্য পৌরসভার সদস্যকে সারাক্ষণের কর্ম্মী হিসাবে

কাজ করতে হবে। এতে তাঁর নিজের কোন স্বার্থ থাকবে না। এর পরবর্তী কাজ হবে বিভিন্ন পৌরসভা বা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-প্রতিষ্ঠানের এলাকাভুক্ত অঞ্চলের যাবতীয় প্রাপ্তবয়স্কের হিসাব নেওয়া। পৌরসভার কার্য্যে প্রত্যেককে সহযোগিতা করতে আহ্বান জানানো হবে। এর একটি যথোপযুক্ত তালিকা রাখতে হবে। দারিদ্র্যবশত যে সব সুস্থ সবল ব্যক্তি পৌরসভাকে আর্থিক সাহায্য দিতে অসমর্থ, এর বদলে বিনামূল্যে তাদের দৈহিক শ্রম দিতে বলা যেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

যুবশক্তির প্রতি আহ্বান

দেশের যুবশক্তির উপরই আমার আশা। যুবকদের ভিতর অনেকে পাপাসক্ত হলেও তারা স্বভাবপাপী নয়। অসহায়ভাবে পূর্ব্বাপর চিন্তা না করে তারা এ পথে এসে পড়েচে, এতে যে তাদের এবং সমাজের কি হানি হচ্চে তা তাদের উপলব্ধি করতে হবে, তাদের বুঝতে হবে যে কঠোর অনুশাসনময় জীবনযাত্রা ছাড়া আর কিছুই তাদের বা দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে পারে না।

সর্ব্বোপরি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করা পর্য্যন্ত এবং লোভ থেকে বাঁচার জন্য তাঁর সহায়তা যাজ্ঞা না করা পর্য্যন্ত নীরস অনুশাসন তাদের বিশেষ কিছু হিত সাধন করতে সমর্থ হবে না। বাহ্যিক কোন প্রকাশ ছাড়াই শিশু যেমন মায়ের স্নেহ অনুভব করতে পারে, তেমনি তিনি আমাদের হৃদয়ে বিরাজমান, এই অনুভূতি আসাকেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা বলা হয়।

যে সব নবযুবক অনতিবিলম্বে পিতৃত্বের গৌরব লাভ করবে, জাতির পক্ষে তারা হচ্চে ঠিক লবণের মত। লবণ তার স্বাদ হারিয়ে ফেললে পরে লবণাক্ত করা হবে কি দিয়ে?

যুবশক্তি দুনিয়ার সর্ব্বত্রই চঞ্চল। সুতরাং পঠদ্দশায় অর্থাৎ অন্তত ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বিশেষ চিন্তা না করেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করা একান্ত প্রয়োজন।

নিষ্পাপ যৌবন এক অমূল্য সম্পদ এবং ক্ষণিকের উত্তেজনা বা আনন্দ মেটানোর জন্য এর অপব্যয় অনুচিত।

তোমাদের (নবযুবকদের) আমি গ্রামে যেতে অনুরোধ করচি, এবং প্রভু বা উদ্ধারকর্ত্তা হিসাবে নয়, গ্রামবাসীর দীন সেবক হিসাবে, গ্রামের

মধ্যে তোমাদের ডুবে থাকতে আবেদন জানাচ্ছি। কেমন ভাবে জীবনযাত্রা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন সাধন করতে হয়, তা তারা তোমাদের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী দেখে শিখুক। যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে বাষ্প যেমন এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়, এবং নিয়ন্ত্রণে না রাখলে বাষ্পের যেমন নিজস্ব কোন মূল্য নেই, তেমনি গ্রামবাসীদের জন্য হৃদয়ে শুধু দরদ থাকাই যথেষ্ট নয়। ভারতের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে প্রলেপ লেপন করার জন্য ঈশ্বরের দূত হয়ে তোমাদের আমি বেরিয়ে পড়তে অনুরোধ জানাচ্ছি।

গ্রামের কাজে আমরা ভয় পাই। আমরা যারা সহরে মানুষ, গ্রাম্য জীবন গ্রহণ করাকে এক মহা পরীক্ষা বলেই মনে করি। এই কঠোর জীবনযাত্রা-প্রণালী গ্রহণ করার আহ্বানে সময় সময় আমাদের শরীরও ঠিক সাড়া দেয় না। জনসাধারণের জন্য স্বরাজ স্থাপনই যদি আমাদের অভিপ্রেত হয়, শুধু একদলের বদলে অন্য দলের শাসন, যা হয়ত আরও খারাপ হতে পারে, এ যদি আমরা না চাই, তবে বীরের মত সাহসের সঙ্গে আমাদের এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। এর আগে আমাদের বাঁচানোর জন্য গ্রামবাসীরা হাজারে হাজারে জীবন দিয়েচে। এবার এর মূল নীতির পরিবর্ত্তন সাধন করতে হবে। অনিচ্ছায়, না জেনেশুনে, এর আগে তারা প্রাণ দিয়েচে। তাদের অনিচ্ছা-কৃত আত্মত্যাগে আমাদের হীনতারই বৃদ্ধি ঘটেচে। এখন যদি আমরা জ্ঞাতসারে, স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করি, তবে সে মৃত্যু আমাদের এবং সমস্ত জাতিকে মহান করে তুলবে। স্বাধীন আত্মগরিমাসম্পন্ন জাতি হিসাবে যদি আমরা বেঁচে থাকতে চাই, তবে যেন প্রয়োজনীয় ত্যাগে আমরা বিমুখ না হই।

ভারতকে পাওয়া যাবে গ্রামে, সহরে নয়। তবে সহরবাসীরা যদি দেখাতে চায় যে, ভারতের গ্রামের জন্য তারা কাজ করবে, তবে দরিদ্রদের সাথে বন্ধুত্ব

স্থাপন করার জন্য এবং তাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্য তাদের সম্পদের অধিকাংশ ব্যয় করতে হবে।

তাদের উপর আমরা প্রভুত্ব করব না, তাদের সেবক হ'তে শিক্ষা গ্রহণ করব। দরিদ্রদের মঙ্গল করা উচিত বলে যখন সহরগুলি উপলব্ধি করবে তখন তাদের হর্ম্ম্যরাজি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং জীবনযাত্রাপ্রণালী অন্তত কিছু পরিমাণে আমাদের গ্রামগুলির সদৃশ হবে।

গ্রামসেবক কে হ'তে পারে? স্বীয় কর্ত্তব্যের বোধ ও সূতা কাটার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান্ প্রত্যেক কর্ম্মীর সম্যক্ রূপে থাকা প্রয়োজন। গ্রামে যদি কর্ম্মীটি আদর্শ জীবন যাপন করতে চায়, তবে পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলি তার জানা প্রয়োজন এবং নিজের জীবনযাত্রাপ্রণালী দ্বারা তার গ্রামে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করা প্রয়োজন। দৈনন্দিন অসুখবিসুখের গৃহচিকিৎসা-পদ্ধতি তার জানা দরকার। মোটামুটি হিসাব রাখার পদ্ধতি তাকে জানতে হবে। গ্রামবাসীদের আস্থা অর্জ্জন করতে হ'লে এবং তাদের মধ্যে খ্যাতি অর্জ্জন করতে হ'লে সর্ব্বোপরি তাকে পবিত্র এবং সরল জীবন যাপন করতে হবে। গ্রামসেবক স্বভাবতই সরল এবং মিতব্যয়ী জীবনে আনন্দ পাবে। এ পদ্ধতি দুরূহ বোধ হ'লেও ধৈর্য্যশীল ছাত্রের কাছে কখনও কঠিন মনে হবে না। চরিত্রের শুচিতাকে এর যে-কোন কাজে স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা হয়েচে। কোন গ্রামসেবক নিজে যদি পরিচ্ছন্নতার নিয়মগুলি সম্বন্ধে অজ্ঞ হয় এবং সেগুলি যথাযথ ভাবে পালন না করে, এবং সাধারণ রোগের গৃহচিকিৎসা-পদ্ধতি যদি তার জানা না থাকে তবে কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতার অভাব, অপুষ্টিকর খাদ্য, এবং জড়তা এই যে তিনটি রোগ গ্রামগুলিকে তাদের বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে, তার সমাধান করা প্রয়োজন।

নিজেদের শুভাশুভের প্রতি তারা মনোযোগী নয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার আধুনিক ব্যবস্থার তারা প্রশংসা করে না। কোন রকমে একটুখানি জমি আঁচড়ান বা ঐ জাতীয় যাতে তারা অভ্যস্ত তা করা ছাড়া অন্যরকমে তারা আর শরীরকে খাটাতে চায় না। এ অসুবিধাগুলি বাস্তব এবং কঠিন। তবে এতে হতাশ হ'লে আমাদের চলবে না। আদর্শে আমাদের অবিচল বিশ্বাস থাকা দরকার। আমরা হব ধৈর্য্যশীল, গ্রামের কাজে আমরা শিক্ষানবীশ মাত্র। এক পুরোনো রোগ নিয়ে আমাদের কাজ। আমরা ধৈর্য্যশীল এবং অধ্যবসায়ী হ'লে পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিঘ্নও অতিক্রম করতে পারি। আমরা হচ্চি রোগীর পরিচর্য্যাকারিণীদের মত, রোগীর দুরারোগ্য ব্যাধি হয়েচে জানলেও যারা ধৈর্য্য হারায় না।

এর একমাত্র পন্থা হচ্চে তাদের সঙ্গে থেকে অবিচল বিশ্বাসের সাথে তাদের ঝাড়ুদার, শুশ্রূষাকারী, এবং সেবকের মত কাজ করে যাওয়া। আমাদের যাবতীয় পূর্ব্বসংস্কার এবং পক্ষপাত ত্যাগ করতে হবে, এবং তাদের মুরুব্বি বলে নিজেদের মনে করলে চলবে না। যে সব কায়েমী স্বত্ববানদের অস্তিত্ব আমাদের পদে পদে উৎপীড়িত করে, তাদের এবং এমনকি স্বরাজের কথাও আমাদের ক্ষণিকের জন্য ভুলতে হবে। এ সব যে আছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই সব বিরাট সমস্যা নিয়ে আরও অনেকে নাড়াচাড়া করচেন। এর তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ এই গ্রামের কাজ, যার এখন প্রয়োজনীয়তা রয়েচে এবং এমন কি আমাদের লক্ষ্যস্থলে উপনীত হবার পরও যার সমান প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে, তাই নিয়ে আমরা যেন কাজ করে যাই। বস্তুত গ্রামের কাজে সাফল্য লাভ করলে আমরা আমাদের লক্ষ্যের অধিকতর নিকটবর্ত্তী হব।

তাদের (ভারতীয় কৃষককুলের) সাথে আপনি যখন আলাপ করবেন এবং তারা যেই কথা বলা সুরু করবে, আপনি দেখবেন যে, তারাও কেমন জ্ঞানের

পরিচয় দেয়। বাইরের রূঢ় আবরণের পিছনে আপনি এক গভীর আধ্যাত্মিকতার খনির সন্ধান পাবেন। এ'কে আমি সংস্কৃতি আখ্যা দিই—পাশ্চাত্য দেশ সমূহে আপনি এমনটি কখনও পাবেন না। কোন ইউরোপীয় কৃষকের সাথে কথাবার্ত্তা বলে দেখুন, আধ্যাত্মিক বিষয়ের প্রতি তার আকর্ষণ নেই।

ভারতীয় কৃষকদের রূঢ়তার আবরণের মধ্যে এক যুগ-যুগান্তরের পুরোনো সংস্কৃতি লুকিয়ে আছে। তার সে আবরণ সরিয়ে নিন, দূর করুন তার বহু দিনের সঞ্চিত দারিদ্র্য ও অশিক্ষা, তা হ'লেই আপনি সংস্কৃতিসম্পন্ন, সুসভ্য, স্বাধীন নাগরিকের সুন্দরতম নমুনা দেখতে পাবেন।

গ্রামসেবার অর্থ আদর্শ শিক্ষা। শুধু লিখতে পড়তে শিখলে বা হিসাব রাখতে জানলেই এ শিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না। আদর্শ জীবনের প্রয়োজন সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের ভাবতে শেখানো এবং মানুষের চিন্তাধারা যে পথে বওয়া উচিত সেই পথে তাদের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করাই হবে আদর্শ শিক্ষার লক্ষ্য।

উপযুক্ত গৃহের চেয়ে ভাল বিদ্যালয় এবং সৎ ও ধার্ম্মিক পিতামাতার চেয়ে উপযুক্ত শিক্ষক আর নেই। গ্রামবাসীদের কাছে আধুনিক (উচ্চ বিদ্যালয় সমূহের) শিক্ষা, পাষাণভারের মত। তাদের সন্তান-সন্ততি কখনই এ শিক্ষা পাবে না এবং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, যে কোন উপযুক্ত গৃহে শিক্ষা পেলে এর অভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্তও হবে না। গ্রামসেবক বা সেবিকা যদি মানুষ হিসাবে আদর্শ না হয়, তারা যদি কোন ঘর উপযুক্ত ভাবে সামলাতে না পারে, তবে তাদের পক্ষে গ্রামসেবকের এই সুমহান ব্রত গ্রহণ করার এবং এই সম্মান পাবার চেষ্টা না করাই ভাল। শুধু লেখাপড়া ও হিসাব রাখতে শিখলে তাদের চলবে না, বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থা ও তার উন্নতির উপায় সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান থাকা চাই। কর্ম্মের আনন্দের অনুভূতিবিহীন হয়ে, পারিপার্শ্বিকতার প্রতি সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন অবস্থায়, স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত আজ তারা কাজ করে চলেছে।

চিরকালই ভারতের গ্রামগুলি আজকের মত ছিল কিনা এ নিয়ে গবেষণা করা নিরর্থক। কখনও যদি তাদের অবস্থা এর চেয়ে ভাল না থেকে থাকে তবে এ হচ্ছে আমাদের এত সাধের প্রাচীন সংস্কৃতির কলঙ্ক স্বরূপ। আর তাদের অবস্থা যদি কখনও এর চেয়ে শ্রেয় নাই ছিল, তবে আমাদের চারিধারে এই যে ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করচি, যুগ যুগ ধরে তা এ এড়াল কেমন ভাবে? এই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা, অর্থাৎ এমন করে ভারতের গ্রামসমূহের পুনর্গঠন করা, যাতে যে কোন কারও পক্ষে গ্রামে থাকা সহরে থাকার মত সহজসাধ্য বলেই বোধ হয়, তার চেষ্টা করা প্রত্যেক দেশ-প্রেমিকেরই কর্ত্তব্য। বস্তুত প্রত্যেক দেশপ্রেমিকের সামনে এই হচ্ছে এক-মাত্র কর্ত্তব্য। হতে পারে গ্রামগুলি মুক্তি পাবার অযোগ্য, হতে পারে গ্রামীন সভ্যতার দিন চলে গেছে, এবং সাত লক্ষ গ্রামের বদলে হয়ত সাত শত সুসংবদ্ধ এবং সুগঠিত সহরের পত্তন হবে, যেখানে বসবাস করবে তিন কোটি নয়, ত্রিশ কোটি লোক। এই যদি ভারতের ভাগ্যের লিখন হয়, তবে সেও একদিনে আসবে না। এত সব গ্রাম এবং গ্রামবাসীকে নিশ্চিহ্ন করে বাকিগুলিকে নগর এবং নাগরিকে পরিণত করতে যথেষ্ট সময় লাগবে।

নবম অধ্যায়

স্বদেশীর বাণী

যে উদ্দীপনার বশবর্ত্তী হয়ে আমরা দূরের জিনিষের পরিবর্ত্তে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা আমাদের প্রয়োজন মেটাই তাকেই বলে স্বদেশী। এই ভাবে ধর্ম্মের ব্যাপারে এই সংজ্ঞা অনুযায়ী উপযুক্ত আচরণ হচ্চে পৈতৃক ধর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখা। এরই নাম হচ্চে স্বীয় চতুষ্পার্শ্বস্থ ধর্ম্মের গণ্ডীর উপযোগ করা। আমার নিজের ধর্ম্মে আমি যদি কোন দোষ দেখি তবে আমি তার সে দোষ মুক্ত করে তার সেবা করব। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি স্বদেশী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহায়তা করব এবং তাদের প্রমাণিত দোষগুলির সংশোধন করে তার সেবা করব। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমার নিকটতম প্রতিবেশী দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যসমূহই শুধু আমি ব্যবহার করব এবং ঐ ব্যবসাগুলির কোন ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে সেগুলির সংশোধন করে তাদের সুচারুরূপে পরিচালনার বন্দোবস্ত করে আমি তার সেবা করব। অনেকে বলেন এরকম স্বদেশী কাজে পরিণত করা প্রায় অসম্ভব।

স্বদেশীর উপযুক্ত তিনটি বিভাগ সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করে দেখা যাক। স্বদেশী মনোবৃত্তি অন্তর্নিহিত থাকার জন্য হিন্দুধর্ম্ম এক রক্ষণশীল ধর্ম্মে এবং সেই কারণে এক বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়েচে। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরমতসহিষ্ণু, কারণ এতে ধর্ম্মান্তরিত করণের স্থান নেই এবং পূর্ব্বের ন্যায় এখনও এই ধর্ম্ম সম্প্রসারণক্ষম। আমার মতে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মের বিলুপ্তি ঘটায়নি, বরং সুষ্ঠুভাবে বৌদ্ধধর্ম্মকে নিজের সাথে একাঙ্গীভূত করেচে। স্বদেশী ভাবের জন্যই একজন হিন্দু ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনে অনিচ্ছুক। অবশ্য এর

অর্থ এই নয় যে, তার নিজ ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ,* বরং সে জানে যে এর সংস্কার সাধন দ্বারা সে এর পরিপূর্ত্তি ঘটাতে পারে। আমার বোধ হয় যে, হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার বক্তব্য জগতের যাবতীয় মহান ধর্ম্মবিশ্বাসগুলি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। এবার আসচে সেই কথা যার জন্য আমি এত উপক্রমণিকা করেচি। যেসব কথা আমি বলেচি তার মধ্যে যদি বিন্দুমাত্র পদার্থ থাকে, তবে ভারতে যে সমস্ত ধর্ম্ম প্রচারের প্রতিষ্ঠান আছে, যাদের কাছে তাদের অতীত এবং বর্ত্তমান কার্য্যকলাপের জন্য ভারতবাসী কৃতজ্ঞ, তারা ধর্ম্মান্তরিত করণের উদ্দেশ্য বর্জ্জন করে, জনসেবামূলক কাজগুলি চালিয়ে গেলে, সে কি অধিকতর সুচারুরূপে খৃষ্টীয় আদর্শের সেবা হয় না ?

এই স্বদেশী মনোবৃত্তির দৃষ্টিকোণ থেকে আমি দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে দেখি, এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েত প্রথা আমার ভাল লাগে। সত্যসত্যই ভারত একটি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র এবং এই জন্য অতীতের যাবতীয় আঘাতের হাত এড়িয়ে ভারত আজও টিঁকে আছে। রাজস্ব আদায় করা ছাড়া, ভারতীয় বা অভারতীয় রাজন্যবর্গ কোন দিনই আর কোন ভাবে ভারতের জনসাধারণের সংস্রবে আসেননি। জনসাধারণও তাঁদের পাওনাটুকু মাত্র তাঁদের দিয়ে নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী আর সবই করেচে। শুধু ধর্ম্মের প্রয়োজনেই এই বিরাট জাতিভেদ-প্রথা গড়ে ওঠেনি, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এর প্রয়োজনীয়তা ছিল। জাতিভেদ প্রথা মারফৎ গ্রামবাসীরা তাদের অভ্যন্তরীণ কার্য্যকলাপ পরিচালিত করত এবং এর দ্বারা তারা শাসকগোষ্ঠীর যে কোন অত্যাচারের সম্মুখহীন হ'ত। জাতিভেদ প্রথা মারফৎ যে জাতি এই রকম এক অনবদ্য সংগঠন-প্রতিভার সৃষ্টি করতে পারে, তাদের সংগঠনী শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। সে সংগঠনী শক্তির দক্ষতা যে কতখানি তা বোঝা যায় শুধু হরিদ্বারের কুম্ভমেলা দেখলে, যেখানে বাহ্যত কোন প্রচেষ্টা বিনা লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীর সমাবেশ

হয়ে থাকে। আমাদের সংগঠনী শক্তির অভাব আছে বলাটাই তবু রেওয়াজ হয়ে উঠেচে। অবশ্য নতুন পরিপ্রেক্ষিতে যারা মানুষ হয়েচেন, তাঁদের বেলায় একথা অংশত সত্য।

স্বদেশী মনোবৃত্তির মারাত্মক অভাব জনিত ভীষণ বিপত্তির মধ্যে দিয়ে আমাদের কাজ করতে হয়েচে। বিদেশী ভাষায়, আমরা এই শিক্ষিত সম্প্রদায়, শিক্ষা পেয়েচি। জনসাধারণের ভিতর আমরা তাই কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হইনি। জনসাধারণের আমরা প্রতিনিধিত্ব করতে চাই কিন্তু পারি না। আমাদের তারা ইংরেজ রাজকর্ম্মচারীদের মতই ভাবে। আমাদের উভয়ের মধ্যে কারও কাছেই তারা হৃদয়ের দুয়ার খোলে না। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আমাদের মনে সাড়া জাগায় না। তাই এই বিচ্ছেদ। সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে এতে সংগঠনী শক্তির ব্যর্থতা প্রতীয়মান হয় না বরং দেখা যায় জনসাধারণ ও তাদের প্রতিনিধিবর্গের ভিতর সংযোগের অভাব। বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে যদি মাতৃভাষা মারফৎ আমাদের শিক্ষা দেওয়া হ'ত তবে আমাদের বয়সী দেশবাসী, পরিচারক বা প্রতিবেশী-বর্গ আমাদের জ্ঞানের অংশ গ্রহণ করতেন এবং বসু বা রায়ের আবিষ্কারসমূহ রামায়ণ মহাভারতের মতই আমাদের ঘরোয়া সম্পত্তি হ'ত। জনসাধারণের কাছে বর্ত্তমানে এই সব বিরাট আবিষ্কারগুলি কোন বিদেশীর হ'লেও বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। আমি জোর গলায় বলতে পারি যে, জ্ঞানের সমস্ত বিভাগে যদি মাতৃভাষা মারফৎ শিক্ষা দেওয়া হ'ত, তবে তার অভাবনীয় সমৃদ্ধি ঘটত। গ্রাম্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সমস্তারও বহুপূর্ব্বে সমাধান হয়ে যেত। স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে গ্রাম্য পঞ্চায়েতগুলি আজ তাহ'লে এক জীবন্ত শক্তির আধার হ'ত এবং ভারতবর্ষ তার প্রয়োজনানুগ স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। ভারতের পুণ্যভূমিতে তাহ'লে এই ঘৃণ্য সঙ্ঘবদ্ধ হানা-

হানির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা থেকে রেহাই পাওয়া যেত। তবে শোধরানোর অবসর এখনও আছে।

স্বদেশীর তৃতীয় এবং শেষ লক্ষ্যটির সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক। অর্থনীতি এবং শিল্পনীতির ক্ষেত্রে স্বদেশী মনোবৃত্তির মারাত্মক অভাবই জনগণের এই বিরাট দারিদ্র্যের জন্য বহুলাংশে দায়ী। একটি মাত্র পণ্যও যদি বিদেশ থেকে ভারতে না আনতে হয়, তবে ভারত আবার ধনধান্যে ভরে উঠবে। কিন্তু তা হবার নয়। আমরা ছিলাম লোভাতুর এবং ইংল্যাণ্ডও তদ্রূপ। ভারত এবং ইংলণ্ডের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ভুলের ভিত্তির উপর। তবে ইংলণ্ড যে ভারতের উপর চেপে বসে রয়েচে এতে কোন ভুল নেই। ভারতকে তার জনসাধারণের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হবে এই হচ্চে ইংলণ্ডের বহুবিঘোষিত নীতি। এ যদি সত্য হয় তবে ল্যাঙ্কাশায়ারের স্থান এর মধ্যে নেই। আর স্বদেশী নীতি যদি অভ্রান্ত হয় তবে ল্যাঙ্কাশায়ারের সাময়িক কিছু ক্ষতি হলেও শেষ পর্য্যন্ত এ অক্ষত হয়ে বিরাজিত থাকবে। স্বদেশীকে আমি প্রতিশোধাত্মক বর্জ্জননীতি বলে মনে করি না। এ'কে আমি সর্ব্বজনগ্রাহ্য ধর্ম্মনীতি বলে বিবেচনা করি। আমি অর্থনীতিবিদ্ নই, তবে এমন অনেক বই আমি পড়েচি যার থেকে জানতে পেরেচি যে সহজেই ইংলণ্ড প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনকারী আত্মনির্ভরশীল দেশে পরিণত হতে পারে। হয়ত এ'কে এক নিতান্ত হাস্যকর তথ্য বলে মনে হতে পারে এবং এ যে মিথ্যা তার সবচেয়ে শক্তিশালী যুক্তি হচ্চে এই যে ইংল্যাণ্ড দুনিয়ার ভিতর অন্যতম প্রধান আমদানীকারী দেশ। তবে নিজের ব্যবস্থা না হওয়া পর্য্যন্ত ল্যাঙ্কাশায়ারের জন্য ভারত জীবন ধারণ করতে পারে না। ভারত যদি তার সীমানার মধ্যে নিজের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিষ উৎপন্ন করতে পারে তবেই সে তার

নিজের ব্যবস্থা করতে পারবে। যে উন্মত্ত এবং ধ্বংসদ্যোতক প্রতিযোগিতার ফলে হিংসা এবং ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দের সৃষ্টি হয় তার আবর্ত্তের মধ্যে ভারত যাবে না এবং তার যাওয়া উচিতও হবে না। কিন্তু ভারতের কোটিপতিদের জগৎজোড়া প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখবে কে? আইন নিশ্চয় তা পারবে না। এই আকাঙ্ক্ষিত মার্গে জনমতের চাপ এবং উপযুক্ত শিক্ষা অবশ্যই যথেষ্ট কিছু করতে পারে। হস্তচালিত বয়নশিল্প আজ মৃতপ্রায়। ভ্রমণকালে আমি যতগুলি পারি বয়নকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেচি। কেমনভাবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েচে, কেমনভাবে বহু পরিবার একদা সমৃদ্ধিশালী এবং সম্মানজনক এই পেশা ত্যাগ করেচে, এ দেখে আমার হৃদয় বেদনায় অভিভূত হয়ে উঠেচে।

স্বদেশী নীতি গ্রহণ করলে আপনার আমার সকলেরই কর্ত্তব্য হবে আমাদের যে সমস্ত প্রতিবেশী আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের চাহিদা মেটাতে পারে, তাদের খুঁজে বাহির করা। কি করে আমাদের চাহিদা মেটানো যেতে পারে, একথা যাদের জানা নেই, তাদের এ শেখাতে হবে, কারণ আমাদের দেশে এমন বহু লোক আছে যাদের যথোপযুক্ত পেশার নিতান্তই অভাব। তা হ'লে ভারতের প্রত্যেক গ্রাম মোটামুটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং আত্মনির্ভরশীল হবে এবং একমাত্র যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষ স্থানীয় প্রচেষ্টায় তৈরী হওয়া সম্ভব নয়, অপরাপর গ্রামের সাথে সেইগুলির বিনিময় করবে। এসব হয়ত অর্থহীন মনে হতে পারে। সারা ভারতবর্ষই যে অসঙ্গতিতে পূর্ণ। কোন সহৃদয় মুসলমান যখন বিশুদ্ধ পানীয় জল দেন তখন তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে মরা অর্থহীন। তবু এমন বহু হিন্দু আছেন, যাঁরা তৃষ্ণায় মরে যাবেন কিন্তু কোন মুসলমান গৃহস্বামীর হাতের জল খাবেন না। ধর্ম্মের খাতিরেই তাঁদের ভারতে প্রস্তুত পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা ও খাদ্য গ্রহণ করা উচিত।

একথা যদি একবার এই সমস্ত অসঙ্গত আচরণকারী জনসাধারণকে বোঝান যায়, তবে এরাও বিদেশী পোষাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্য বর্জ্জন করতে পারে।

ভগবদ্গীতাতে একটি শ্লোক আছে যার মোটামুটি অর্থ হচ্চে এই যে, জনসাধারণ গোষ্ঠীরই অনুকরণ করে। সাময়িক ভাবে প্রভূত অসুবিধা হওয়া সত্ত্বেও কোন গোষ্ঠীর চিন্তাশীল অংশ যদি স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করে, তবেই এই অন্যায় দূরীভূত হতে পারে। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে আইনের হস্তক্ষেপকে আমি ঘৃণা করি। বড়জোর এ'কে ন্যূনতর অন্যায় বলা যেতে পারে। কিন্তু বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চহারে রক্ষণ-শুল্ক চাপানোকে আমি মেনে নেব, অভিনন্দন জানাবো এবং এমনকি এর স্বপক্ষে আন্দোলন চালাব। নাটাল একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ হওয়া সত্ত্বেও অপর একটি ব্রিটিশ উপনিবেশ মরিশাসের চিনির উপর শুল্ক ধার্য্য করে নিজের চিনির ব্যবসা রক্ষা করেছিল। ভারতের সাথে অবাধ বাণিজ্য চালিয়ে ইংলণ্ড ভারতের প্রতি অন্যায় করেচে। তাদের কাছে এ জীবন-রসায়ন হতে পারে, কিন্তু এদেশে এ প্রথা বিষতুল্য পরিগণিত হয়েচে।

কখনও কখনও বলা হয় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত কোন দিনই স্বদেশী নীতি গ্রহণে সমর্থ হবে না। যাঁরা এ আপত্তি তোলেন, স্বদেশীকে তাঁরা জীবনের ধর্ম্ম বলে মনে করেন না। তাঁদের কাছে এ শুধু এক দেশপ্রেমিকতার প্রচেষ্টা এবং আত্মনিগ্রহের সম্ভাবনা থাকলে এ প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। এই স্থলে প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী স্বদেশী হচ্চে এক ধর্ম্মীয় অনুশাসন, ব্যক্তিগত শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তিলমাত্র দৃষ্টিপাত না করেও যা পালন করা কর্ত্তব্য। এর যাদুতে পড়লে, একটি কাঁটা বা সূঁচ ভারতে তৈরী নয় বলে তাকে ত্যাগ করতে হলেও, তাতে কোন রকমেই আতঙ্ক হয় না। আজ যে সমস্ত জিনিষ আমরা একান্ত আবশ্যকীয় মনে করি, তার বহু কিছু

ছাড়াই স্বদেশীওয়ালাকে কাজ চালাতে শিখতে হবে। তা ছাড়া স্বদেশীকে অসম্ভাব্য বলে যাঁরা মন থেকে বিসর্জ্জন দেন, তাঁরা ভুলে যান যে স্বদেশী হচ্চে একটি আদর্শ এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এ আদর্শে পৌছাতে হয়। নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি দ্রব্যের মধ্যে স্বদেশীকে সীমাবদ্ধ রেখে সাময়িক ভাবে যদি আমরা ভারতে যে সব জিনিষ পাওয়া সম্ভব নয় সেগুলি ব্যবহার করি তবুও আমরা স্বদেশী আদর্শের পরিপূর্ত্তির পথে অগ্রসর হব।

স্বদেশীর বিরুদ্ধে আর একটি আপত্তি তোলা হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা বাকি রয়ে গেছে। আপত্তিকারীরা এ'কে সভ্যতার নীতিশাস্ত্রের বিধি-বহির্ভূত এক নিতান্ত স্বার্থপর মতবাদ বলে বিবেচনা করেন। তাঁদের কাছে স্বদেশী গ্রহণ করার অর্থ হ'ল বর্ব্বরতার যুগে প্রত্যাবর্ত্তন। আমার পক্ষে বর্ত্তমানে এই ব্যাপারের বিশদ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। তবে আমি একথা বলব যে, স্বদেশীই হচ্চে একমাত্র নীতি যার সাথে প্রেম এবং বিনয়ের সঙ্গতি বিগুমান। নিজের পরিবারের যখন আমি সেবা করতে পারি না, তখন সারা ভারতের সেবা করার পরিকল্পনা করা অনুচিত ঔদ্ধত্য মাত্র। বরং নিজ পরিবারের মধ্যেই আমার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করা উচিত এবং আমার ভাবা উচিত যে এর মারফৎই আমি সমস্ত জাতি ও এমন কি সমগ্র মানব-সমাজের সেবা করচি। এই হচ্চে বিনয় এবং এ'কেই বলে প্রেম। উদ্দেশ্যই কাজের গুণাগুণ বিচার করবে। অপরের প্রতি আমি যে অবিচার করচি সেদিকে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত না করেও আমি নিজ পরিবারের সেবা করতে পারি। উদাহরণ স্বরূপ, আমি এমন একটি চাকুরি নিতে পারি, যাতে জন-সাধারণের কাছ থেকে অর্থশোষণ করা যায়। এর দ্বারা আমি নিজে ধন সংগ্রহ করে আমার পরিবারের বহু অন্যায় দাবি পূর্ণ করতে পারি। এ অবস্থায় আমি নিজ পরিবার বা রাষ্ট্রের কোনটিরই সেবা করচি না। আমি বরং

ভাবব যে; ভগবান আমাকে হাত পা দিয়েচেন, নিজের এবং আমার আশ্রিত-বর্গের ভরণপোষণের জন্য পরিশ্রমার্থে। সে ক্ষেত্রে আমি তৎক্ষণাৎ নিজের এবং সহজে যাদের প্রবুদ্ধ করতে পারি, তাদের জীবনযাত্রাপ্রণালী আরও সাদাসিধে করব। এক্ষেত্রে অপর কারও ক্ষতি না করে নিজের পরিবারের সেবা করা হবে। সকলে এই রকম জীবনযাত্রাপ্রণালীকে অনুসরণ করলে এক আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপিত হবে। সবাই অবশ্য এই আদর্শে একযোগে উপনীত হতে পারবে না। তবে এর অন্তর্নিহিত সত্যকে অনুধাবন করে আমাদের মধ্যে যাঁরা এ'কে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করবেন, নিঃসন্দেহেই তাঁরা সেই সুখপ্রভাতের আবির্ভাবকে ত্বরান্বিত করবেন। এই জীবনযাত্রাপ্রণালীতে অন্যান্য দেশকে বাদ দিয়ে শুধু ভারতের সেবা করা হয় মনে হলেও, আমার মতে এতে অপর কোন দেশেরই অনিষ্ট করা হয় না। আমার স্বদেশপ্রেম যেমন বর্জ্জন-ধর্ম্মী তেমনি আবার গ্রহণ-ধর্ম্মীও বটে। বর্জ্জন-ধর্ম্মী এই অর্থে যে যথোচিত বিনয় সহকারে আমি আমার জন্মভূমির প্রতিই আমার মনোযোগকে সীমাবদ্ধ করে রাখি, আবার এ গ্রহণ-ধর্ম্মী এই অর্থে যে আমার সেবা প্রতিযোগিতা বা বিরোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। "এমন ভাবে নিজের জিনিষ ব্যবহার কর যে অপরের যেন ক্ষতি না হয়।" প্রবচনটি শুধু আইনের কথাই নয়। জীবনের এ একটি সুন্দর মূলমন্ত্র। যথাযোগ্য ভাবে অহিংসা বা প্রেমের সাধনায় এই হচ্চে আসল কথা।

দশম অধ্যায়

চরখার গান

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ভারতের আর্থিক এবং নৈতিক অভ্যুত্থানের পথে চরখা এবং হস্তচালিত তাঁতের পুনরুদ্ধারই হবে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান পাথেয়। কৃষি-কার্য্যের পরিপূরক হিসাবে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের জন্য কোন সহজ শ্রম-শিল্পের প্রয়োজন। পূর্ব্বে সূতা কাটা ছিল সেই কুটিরশিল্প, আর লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে বুভুক্ষার হাত থেকে বাঁচাতে হ'লে তাদের গৃহে আবার সূতো কাটা প্রচলন করতে হবে এবং প্রত্যেক গ্রাম পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবে তার তন্তুবায়দের।

চরখায় যখনি আমি সূতো কাটি ভারতের দরিদ্রদের কথা আমার মনে পড়ে যায়। ধনিক বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চেয়েও বেশী মাত্রায় আজ ভারতের দরিদ্র জনসাধারণ ঈশ্বরের উপর আস্থা হারিয়েচে। ক্ষুধার তাড়নায় যে উৎপীড়িত, এবং শুধু পেটভরা ছাড়া আর কিছু যার কাম্য নেই, তার কাছে পেটই ভগবান। তার অন্নের সংস্থান যে করে দেয় সে-ই তার কাছে ঈশ্বর। তার মধ্য দিয়েই হয়ত সে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করতে পারে। শরীরে যাদের সামর্থ্য আছে তাদের ভিক্ষা দেওয়ার অর্থ হচ্চে, নিজেকে এবং তাদের হীন প্রতিপন্ন করা। তারা চায় কোন ধরণের পেশা, আর যে পেশা লক্ষ জনসাধারণকে কাজ দিতে পারবে সে হচ্চে সূতো কাটা। সূতো কাটাকে আমি কৃচ্ছ্রসাধন বা ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান বলে অভিহিত করেচি। আর যেহেতু আমি বিশ্বাস করি যে, যেখানে দরিদ্রের প্রতি খাঁটি এবং কার্য্যকারী প্রেম, সেখানেই ঈশ্বর। সেইজন্য চরখায় যতটুকু আমি সূতো কাটি তার সবটুকুর মধ্যেই আমি ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করি।

প্রয়োজনের তুলনায় পর্য্যাপ্ত সূতো আমাদের কাপড়ের কলগুলিতে তৈরী হয় না, এবং এ যদি তৈরীও হ'ত তবে নিতান্ত বাধ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কলগুলি সূতার ন্যায়সঙ্গত দাম ধার্য্য করত না। খোলাখুলি ভাবেই তারা অর্থ গৃধ্নু। সুতরাং জাতীয় প্রয়োজনানুসারে তারা মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে যাবে না। তাই চরখার কাজ হচ্চে দরিদ্র গ্রামবাসীদের হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা পৌছে দেওয়া। কৃষক-কুলের অবসর-সময়কে কাজে লাগানোর জন্যে প্রত্যেক কৃষিপ্রধান দেশেরই কোন না কোন শ্রমশিল্পের প্রয়োজন। সূতা কাটাই ছিল ভারতের এই ধরণের শ্রমশিল্প।

আমার ঈশ্বর বহু রূপে বিরাজমান। কখনও তাঁকে আমি চরখায় দেখি, কখনও বা প্রত্যক্ষ করি সাম্প্রদায়িক ঐক্যে, এবং কখনও বা তাঁকে দেখতে পাই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মধ্য দিয়ে। এইরূপ যখন যে ভাবে সম্ভব, আমি তাঁর সংসর্গে আসি।

সূতা কাটা হচ্চে কর্ত্তব্য এবং কৃচ্ছ্র সাধন। ভারত মরতে বসেচে। দেশ আজ মৃত্যুশয্যাশায়ী। কোন মুমূর্ষুকে কি কখনও আপনারা দেখেচেন? কখনও কি তার পদতল স্পর্শ করেচেন? তার পদতল শীতল ও অসাড় হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও কপালে তখনও কিয়ৎ পরিমাণ উষ্ণতা থাকায়, আপনি হয়ত এই বলে সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন যে এখনও তার প্রাণবায়ু নির্গত হয়নি। তার জীবনদীপ কিন্তু ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিত হচ্চে। আমাদের মাতৃভূমির পদযুগল অর্থাৎ জনগণেরও এই একই অবস্থা। তারা শীতল ও অবশ। ভারতকে যদি বাঁচাতে চান, তবে আমি যে সামান্য কাজটুকু করতে বলচি, তাই করুন। আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্চি। সময় থাকতে চরখা ধরুন আর নয় ধ্বংস হয়ে যাবেন।

কৃষিকার্য্যে নিরত চাষীদের কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন আমার

অস্বস্তি বোধ হয়। সেই দিনের প্রত্যাশায় আমি আছি, যেদিন দেশের শাসক সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক-চেতনা-সম্পন্ন-শ্রেণী, দেশের দরিদ্র কৃষককুলের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে, নিজেদের জীবনযাত্রা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করবেন, যে তাঁদের ও গরীবদের মধ্যে আজ এই যে ব্যবধান বর্ত্তমান তা মিটে যাবে। রাজন্যবর্গ বা ধনিক শ্রেণীর সৌধসমূহের প্রতি আমার কোন দ্বেষ নেই। তবে তাঁদের কাছে আমার আন্তরিক অনুরোধ এই যে, কৃষক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যে ব্যবধান আজ তাঁদের পৃথক করে রেখেচে, তাকে দূর করার জন্য তাঁরা যেন কিছু চেষ্টা করেন। এমন একটি মিলনসেতু তাঁরা রচনা করুন যাতে তাঁরা দরিদ্র কৃষকদের কাছে পৌছাতে পারেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রার সাথে তাঁদের যেন সামান্য কিছুও সামঞ্জস্য থাকে। আমার জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী আমি এই সেতু রচনার চেষ্টা করচি এবং যথোচিত বিনয় সহকারে আমি বলব যে, আপনাদের যাবতীয় স্বর্ণখনি বা ভদ্রাবতীর বিনিময়েও এরকম সেতু আপনারা রচনা করতে অপারগ। অবশ্য আমি একথা জানি যে এইসব স্বর্ণ এবং লৌহ খনির প্রয়োজনীয়তা আছে। কোন কিছু ধ্বংস করার কথা আমি চিন্তাতেও স্থান দিই না। আমি চাই রচনা করতে, শুধরে দিতে এবং উন্নতি বিধান করতে। সেইজন্যেই আমি আপনাদের বলচি যে, চরখার ঐ ক্ষীণ সূতাই হচ্চে সেই জিনিষ, দরিদ্র জনসাধারণের সাথে যা আমাদের এক পবিত্র এবং অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। দেশের হাতে কাটা সূতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা থেকেই জানা যাবে যে, প্রাসাদ এবং কুটীরের ব্যবধান ঘোচাবার কাজে কতটুকু আপনার অবদান। প্রতি-যোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে কোন প্রচলিত শ্রমশিল্পকে স্থানচ্যুত করা চরখার কাজ নয়, বা সূতা কাটার উদ্দেশ্যও সে রকম নয়। যে সব সুস্থ সমর্থ লোক অন্য কোন লাভজনক পেশা দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাদের একজনকেও

সে কাজ ছাড়ানোর উদ্দেশ্য চরখার নেই। ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা অর্থাৎ কৃষির পরিপূরক কোন শ্রমশিল্প না থাকার দরুন, ভারতের জনসংখ্যার যে বিরাট অংশকে বৎসরে প্রায় ছয় মাস কাল বাধ্য হয়ে বেকারত্বকে বরণ করতে হয়, এবং তার ফলে জনসাধারণকে যে চিরস্থায়ী অনশনে কালাতিপাত করতে হয়, তার একমাত্র দ্রুত বাস্তব এবং স্থায়ী সমাধান এ করতে পারে, এই হচ্চে এর তরফ থেকে একমাত্র দাবী।

অতি স্বাভাবিক এবং সরল উপায়ে, নিতান্ত কম খরচে ও ব্যবসায়ী-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা আর্থিক অনটন রূপ সমস্যার সমাধানের গৌরবের অধিকারী বলে চরখার তরফ থেকে আমি দাবী জানাই। চরখা তাই অপ্রয়োজনীয় নয়, প্রত্যেক গৃহস্থের এ এক অত্যাবশ্যক এবং অপরিহার্য্য সামগ্রী। এ হচ্চে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্থাৎ মুক্তির নিদর্শন। বাণিজ্যিক সংগ্রামের নিদর্শন এ নয়, এ হচ্চে বাণিজ্যিক শান্তির প্রতীক। দুনিয়ার কোন জাতির প্রতিই এ বিদ্বেষ পোষণ করে না, সবার কাছেই এ শুভেচ্ছা এবং স্বাবলম্বনের বাণী পৌঁছে দেয়। জগতের শান্তিভঙ্গকারী বা দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ শোষণকারী কোন নৌ-বাহিনীর সহায়তার প্রয়োজন এর নেই। আজ যেমন সকলে নিজের খাদ্যদ্রব্য স্বগৃহে প্রস্তুত করে নেয় তেমনি এর জন্য লক্ষ লক্ষ জনসাধারণকে ধর্ম্মীয় সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় সূতা নিজ গৃহে কেটে নিতে হবে। আমার বহু ভুলভ্রান্তির জন্য ভাবীকাল হয়ত আমার প্রতি দোষারোপ করবে, তবে চরখার পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা দেবার জন্য যে তারা আমায় প্রশংসা করবে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, এর জন্য আমার সব কিছু আমি পণ করেছি। কারণ চরখার চাকার প্রতিটি আবর্ত্তনের সাথে সাথে এর থেকে বেরিয়ে আসে শান্তি, শুভেচ্ছা এবং প্রেম। এই সবের অভাবের ফলে ভারত পরাধীন হয়ে পড়ায় এর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত পুনরুদ্ধারের ফলেই আসবে ভারতের স্বাধীনতা।

একাদশ অধ্যায়

হিন্দু-মুসলিম ঐক্য

বিভিন্ন জাতিপুঞ্জের সাথে তার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আজ আমি আমার দেশবাসীর কাছে অহিংসাকে চূড়ান্ত নীতি হিসাবে গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্চি। হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, শিখ বা পার্শিরা যেন তাদের বিভেদ মেটানোর জন্য হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করে এবং স্বরাজ অর্জ্জনের পন্থাও যেন অহিংস হয়। বলহীনের নয়, সবলের হাতিয়ার হিসাবেই এ'কে আমি ভারতের সামনে উপস্থিত করার স্পর্দ্ধা করচি। বৃথাই হিন্দু-মুসলমানেরা বলে থাকে যে, ধর্ম্মের ব্যাপারে কারও উপর জোরজবরদস্তি করা অন্যায়। একটি গরুকে বাঁচানোর জন্য হিন্দুরা যদি কোন মুসলমানকে হত্যা করে, তবে তাকে জবরদস্তি ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? এ হচ্চে বলপ্রয়োগে একজন মুসলমানকে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করার মত। সেইরকম মুসলমানরা যখন বলপ্রয়োগ করে মসজিদের সামনে হিন্দুদের বাজনা বাজতে দেয় না, তাকে জবরদস্তি ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে? গোলমালের মধ্যে প্রার্থনায় মগ্ন থাকাই তো পুণ্যবানের লক্ষণ। আমাদের ধর্ম্মীয় অনুশাসনকে শ্রদ্ধা দেবার জন্য একে অপরকে বাধ্য করার যদি আমরা ব্যর্থ চেষ্টা করি তবে ভাবীকাল আমাদের অধার্ম্মিক বর্ব্বর বলে ঘৃণা করবে।

উপরে উল্লিখিত দুটি মাত্র বিষয়েও অন্তত যদি আমরা আমাদের পুরাতন অহিংসানীতি (যদি তা আদৌ থেকে থাকে) অনুসরণ করি, তবে আমার বিশ্বাস যে, দুই সম্প্রদায়ের ভিতর বর্ত্তমানে যে তিক্ততা বিদ্যমান তার অনেকখানিরই উপশম হবে। কারণ, আমার মতে সাম্প্রদায়িক তিক্ততা দূরীকরণের

উপায় সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করার পূর্ব্বে, আমাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে অহিংসার ভাব থাকা প্রয়োজন। উভয় সম্প্রদায়েরই স্থির করা উচিত যে, কোন দলই স্বহস্তে আইন গ্রহণ করবে না বরং যেখানে যা কিছু বিরোধ উপস্থিত হবে সেগুলি তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ব্যক্তিগত সালিশি বা আদালত দ্বারা মীমাংসিত হবে। সাম্প্রদায়িক সমস্যায় অহিংসার মূল অর্থ হচ্চে এই। অর্থাৎ, নাগরিক জীবনে যেমন আমরা একে অপরের মাথা ফাটাই না, তেমনি ধর্ম্মীয় ব্যাপারেও আমরা এমন করব না। উভয় দলের মধ্যে অবিলম্বে এই চুক্তি সম্পাদিত করা প্রয়োজন এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আর সব এর পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। এই প্রাথমিক অবস্থার স্বীকৃতি না হ'লে অবিশ্বাস দূরীকরণের বা স্থায়ী কোন সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হবার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনা করার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হবে না।

অরক্ষিত অবস্থায় বিপদের মুখে প্রিয়জনকে ফেলে পালানোর স্থান আমার অহিংসায় নেই। হিংসা এবং ভীরুতা প্রণোদিত পশ্চাদপসরণের মধ্যে আমি হিংসাকেই বেছে নেব। ভীরুর কাছে অহিংসা প্রচার অন্ধকে নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে অনুরোধ করার মতই হবে। সাহসিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন হচ্ছে অহিংসা। স্বীয় অভিজ্ঞতায় আমি হিংসানীতিতে আস্থাবান লোকেদের কাছেও অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে কোন বেগ পাইনি, কাপুরুষ থাকা কালীন (আমি যা বহু বৎসর ছিলাম) আমি মনে মনে হিংসা পোষণ করেচি। যখনই আমি ভীরুতা বর্জ্জন সুরু করলাম, তখনই অহিংসার মর্য্যাদা দিতে শিখলাম। বিপদ উপস্থিত হওয়ায় যে সব হিন্দু তাদের কর্ত্তব্য ছেড়ে পালিয়ে যায় তারা অহিংস বলে বা আততায়ীকে আঘাত করতে অনিচ্ছুক বলে ঐ রকম করে না। তারা মরতে এবং কষ্ট স্বীকার করতে অনিচ্ছুক বলেই

অমন করে; বুলটেরিয়ারকে দেখে যে খরগোসটি ছুটে পালায়, সেটি মোটেই অহিংস নয়। টেরিয়ারকে দেখেই বেচারীর হৃৎকম্প উপস্থিত হয় এবং প্রাণের ভয়ে তাই পালায়।

আখড়া করে অবশ্য এর সমাধান হবে না। তবে শরীরচর্চ্চার জন্য আমি আখড়া পছন্দ করি। সে অবস্থায় অবশ্য এ-গুলি সবার জন্যই হবে। তবে হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের সম্ভাবনায় এগুলিকে যদি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে এর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। মুসলমানরাও যে ঐ রকম কসরৎ করতে পারে এবং খোলাখুলি ভাবে বা সংগোপনে অনুরূপ প্রস্তুতি করতে পারে এই চিন্তা মনে সংশয় এবং ক্রোধের সৃষ্টি করে। এতে কোন রকম প্রতিকারেরই আশা নেই। যে কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তি আছেন তাঁদের কর্ত্তব্য হচ্চে সালিশী প্রথাকে বাধ্যতামূলক এবং জনপ্রিয় করে ঝগড়ার রাস্তা বন্ধ করা।

আমার হিন্দু প্রবৃত্তি আমায় শেখায় যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই কমবেশী সত্য আছে। সবগুলি একই ঈশ্বর থেকে উদ্ভূত। তবে এর সবগুলিই অসম্পূর্ণ মানবীয় সত্তা মারফৎ আমাদের কাছে এসেচে বলে এর কোনটিই সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। প্রত্যেকে যখন নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাসকে যথাযথভাবে মানার চেষ্টা করবে, তখনই স্নরু হবে সত্যকার শুদ্ধি আন্দোলন। এই পরিকল্পনায় চরিত্রকেই একমাত্র মানদণ্ড বলে ধরা হবে। নৈতিক ঊর্দ্ধগতি না হ'লে শুধু দল বদল করায় কি ফল? আমার প্রভাবাধীন যারা তাদের কার্য্যকলাপ দ্বারা সদা সর্ব্বদা ভগবানকে অস্বীকার করচে, তাদের ঈশ্বরের সেবায় (কারণ শুদ্ধি বা তবলিগের অর্থ তো এই হবে) নিযুক্ত করার প্রচেষ্টা করায় কি অর্থ হতে পারে? নিজের চরখায় তেল দেওয়ার প্রবচন পার্থিব ব্যাপারের চেয়ে ধর্ম্মের ক্ষেত্রেই অধিকতর প্রযোজ্য।

স্বীয় অন্তরের অনুপ্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ কোন আর্য্যসমাজী বা মুসলমান প্রচারকের ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচারের ফলে যদি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সঙ্কটাপন্ন হয়, তবে বুঝতে হবে যে, সে ঐক্য একেবারে অগভীর। এ সব আন্দোলনে আমরা কেন ব্যতি-ব্যস্ত হব? এই পরিবর্ত্তন খাঁটি হওয়া দরকার। হিন্দুধর্ম্মে ফিরে আসতে চাইলে যখন খুসী মালকানাদের সে অধিকার আছে। তবে অপর ধর্ম্মের অপযশকারী কোন রকম প্রচারকার্য্য চলতে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এতে পরমতসহিষ্ণুতাকে অস্বীকার করা হবে। এই রকম সব প্রচারকার্য্যের সম্বন্ধে সেরা কর্ম্মপন্থা হচ্চে খোলাখুলি ভাবে এ সবের নিন্দা করা। প্রত্যেক আন্দোলন মাননীয়তার আচ্ছাদনে সজ্জিত হবার চেষ্টা করে। জনসাধারণ সেই আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ামাত্র মাননীয়তার অভাবে আন্দোলন ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

বিরোধের দু'টি স্থায়ী কারণ সম্বন্ধে এখন আলোচনা করা যাক।

প্রথম হচ্চে গো-হত্যা। হিন্দুধর্ম্মের গোষ্ঠী-বিশেষ এবং সর্ব্বসাধারণ, উভয়ের কাছে সমান প্রয়োজনীয় বিধায়, গোরক্ষণকে আমি হিন্দুত্বের মূল-সূত্র বলে মানলেও, এর জন্য মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষের কোন কারণ আমি খুঁজে পাই না। ইংরেজরা প্রতিদিন যে গোহত্যা করচে তার জন্য আমরা কিছু বলি না। একজন মুসলমান একটি গো-হত্যা করা মাত্র আমরা রেগে একেবারে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে যাই। গো-মাতার নামে যেসব দাঙ্গা সংঘটিত হয়ে গেছে, তার সবগুলিতেই উদ্যমের অহেতুক অপব্যবহার করা হয়েচে। এর দ্বারা একটিও গরু রক্ষা পায়নি বরং উল্টে বহু মুসলমানের দেহে আঘাত পড়েচে এবং তার ফলে আরও গো-হত্যা সংঘটিত হয়েচে। নিজেদের ভিতর আগে গো-রক্ষা সুরু করা উচিত। ভারতের মত আর কোথাও বোধ হয় পশুর এত হতাদর করা হয় না।

নিজের ক্লান্ত বলদকে, হিন্দু গাড়োয়ানদের, নিষ্ঠুর অঙ্কুশের তাড়না করতে দেখে আমি অশ্রুমোচন করেচি। আমাদের অধিকাংশ পশুর অর্দ্ধাহারী অবস্থা আমাদের পক্ষে কলঙ্কের বিষয়। হিন্দুরা বিক্রি করে বলেই গরুর গর্দ্দানে কসাই-এর ছুরি পড়ে। এর একমাত্র কার্য্যকরী এবং সম্মানজনক উপায় হচ্চে মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা এবং তাদের উপর গো-রক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া। পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা, তাদের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ বন্ধ করা, যে সমস্ত গো-চারণভূমি অতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাচ্চে তার পুনরুদ্ধার, পশু-বংশের উন্নতি সাধন, দরিদ্র পশুপালকদের কাছ থেকে পশু ক্রয় করা এবং পিঞ্জরাপোলগুলিকে আদর্শ ও স্বাবলম্বী দুগ্ধশালায় পরিণত করা ইত্যাদি হওয়া উচিত গো-রক্ষা সমিতিগুলির কাজ। উপরে উল্লিখিত কাজগুলির মধ্যে যে কোন একটিকে অবহেলা করলে ঈশ্বর এবং মানবের কাছে হিন্দুর পাপাচরণ করা হয়। মুসলমানদের হাতে গো-হত্যা নিবারণ না করতে পারলে তাদের কোনই পাপ হয়না। বরং তারা যখন গো-রক্ষার জন্য মুসলমানদের সাথে বিবাদ করে তখনই হয় ঘোরতর পাপ।

মসজিদের সামনে বাজনার সমস্যা, এবং আজকাল আবার হিন্দুদের দেব-মন্দিরে আরতির সমস্যা, আমার পক্ষে এক বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে উঠেচে। হিন্দুদের তরফ থেকে যেমন গো-হত্যা, মুসলমানদের তরফ থেকেও এ তেমনি এক বেদনাজনক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েচে। হিন্দুরা যেমন মুসলমানদের গো-হত্যা নিবারণে বাধ্য করতে পারে না, মুসলমানেরাও তেমনি বলপূর্ব্বক হিন্দুদের বাজনা বাজানো বা আরতি করা বন্ধ রাখতে পারে না। হিন্দুদের শুভবুদ্ধির উপর তাদের আস্থা রাখতে হবে। হিন্দু হিসাবে আমি, হিন্দুদের পরামর্শ দেব যে, তাঁরা যেন দরকষাকষির মনোবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে তাঁদের মুসলমান প্রতিবেশীদের মনোভাবের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা দেখান

এবং যখনই সম্ভব যেন তাদের সুবিধা করে দেন। আমি অবশ্য খবর পেয়েছি যে, বহু জায়গায় ইচ্ছা করে মুসলমানদের রাগানোর জন্যই ঠিক তাদের প্রার্থনার সময় হিন্দুরা আরতি সুরু করে। এ হচ্চে বন্ধুত্বের নীতি-বহির্ভূত এবং মূর্খতাপ্রসূত কাজ। বন্ধুর মনোভাবের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগ দেওয়াই বন্ধুত্বের রীতি। এর জন্য বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না। তবে শক্তিপ্রয়োগে হিন্দুদের বাজনা বন্ধ করার কথা মুসলমানেরা যেন ভুলেও কল্পনা না করেন। হুমকির সামনে বা হিংসার সামনে নতি স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ হচ্চে নিজের আত্মসম্মান এবং ধর্ম্মবিশ্বাসকে বর্জ্জন করা। তবে হুমকির যে পরোয়া করে না, ক্রোধোদ্দীপনের সুযোগ সে খুব কমই আসতে দেবে এবং এমন কি এ'কে একেবারে এড়াতেও পারে।

আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, নেতৃবৃন্দ না বললে জনসাধারণ কখনও ঝগড়া চায় না। সুতরাং নেতৃবৃন্দ যদি চান যে, ঝগড়াঝাটিকে বর্ব্বরতাজনক এবং অধর্ম্মীয় বিবেচনা করে অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মত আমাদের দৈনন্দিন জীবন থেকে এ'কে মুছে ফেলা হ'ক, তবে নিঃসন্দেহে আমি বলতে পারি যে অনতিবিলম্বে জনসাধারণ তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য স্থাপনে ইচ্ছুক হ'লে হিন্দুদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বিশ্বাস করতে হবে। অন্য যে কোন রকমের ব্যবস্থা মুখে বিস্বাদ ঠেকবে। লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ নিশ্চয়ই ব্যবস্থাপরিষদের বা স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে চায় না। সত্যাগ্রহের যথোপযুক্ত প্রয়োগ যদি আমরা শিখে থাকি, তবে শাসনকর্ত্তা হিন্দু, মুসলমান বা অপর যে কোন সম্প্রদায়েরই হ'ক না কেন, তার বিরুদ্ধে এ'কে প্রয়োগ করা যেতে পারে, প্রয়োগ করাও উচিত। কারণ একজন ন্যায়পরায়ণ শাসনকর্ত্তা বা প্রতিনিধি হিন্দু বা মুসলমান যাই হোন না কেন, সবার কাছেই তিনি ভাল। সাম্প্র-

দায়িক মনোবৃত্তির আমরা অবসান চাই। সংখ্যাগরিষ্ঠদের তাই অগ্রণী হতে হবে এবং তাদের সততায় বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের কাছ থেকে কেমন সাড়া পাওয়া যাচ্চে, তার জন্য অপেক্ষা না করে যখন উভয়ের মধ্যে যে অধিকতর ক্ষমতাশালী সেই অগ্রণী হয়, তখনি পরিবর্ত্তন সম্ভব।

সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে যদি সাম্প্রদায়িক মনোভাব আমদানী করা যায়, তবে সে মারাত্মক হয়ে উঠবে। শাসনকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হ'লে যোগ্যতমের উপরেই এর ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য। কিছুতেই এ ব্যাপারে পক্ষপাত দেখানো চলবে না। পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগকালে সকল সম্প্রদায় থেকে এক এক জন নিলে চলবে না। যোগ্যতম যে পাঁচজন, তারা সমস্তই মুসলমান বা পার্শি যাই হ'ক না কেন, তাদেরই নিতে হবে। প্রয়োজন হ'লে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত কোন নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিদেরই নিম্নতম পদগুলিতে নিয়োগ করা হবে। জনসংখ্যার সাম্প্রদায়িক হারে কোনক্রমেই চাকরীর বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত নয়। জাতীয় সরকারের কাছে শিক্ষায় অনগ্রসর সম্প্রদায় সমূহের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবার দাবী অবশ্যই থাকবে। এ ব্যবস্থা সুচারু রূপে হ'তে পারে। তবে যারা শাসনবিভাগে দায়িত্বশীল পদ গ্রহণে অভিলাষী, প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকলে তবেই তারা সে পদ পাবে।

হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নই হচ্চে আমার কাছে একমাত্র সমস্যা, যার অবিলম্বে সমাধান হওয়া প্রয়োজন। জিন্নাসাহেবের সাথে আমি একমত যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যই হচ্চে স্বরাজ। ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ী এবং আন্তরিক ঐক্য না এলে এই দুর্ভাগা দেশে কোন কিছু করার আমি উপায় দেখি না। অবিলম্বে এই ঐক্য স্থাপনা করা সম্ভব এ কথা আমি বিশ্বাস করি,

কারণ যেমন এ স্বাভাবিক আবার তেমনি উভয়ের প্রয়োজনীয়, আর মানব-প্রকৃতিতে আমার আস্থা আছে। মুসলমানদের হয়ত বহু কৈফিয়ৎ দিতে হবে। তথাকথিত "একেবারে খারাপ"দেরও আমি ঘনিষ্ঠ সংশ্রবে এসেচি। অনুতাপ করার মত একটি ঘটনাও আমার স্মরণে নেই। মুসলমানদের অবিশ্বাসের ভাব দূর হলেই দেখা যাবে যে তারা সাহসী, দয়ালু, এবং বিশ্বাসযোগ্য। হিন্দুরা নিজেরাই কাঁচের বাড়ীর বাসিন্দা বলে মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরে ঢিল ছোড়ার অধিকার তাদের কোনমতেই নেই। চেয়ে দেখুন দলিতবর্গের প্রতি আমরা কি ব্যবহার করেচি আর এখনও করে চলচি।

প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শাস্তি দেন না। তাঁর পন্থা দুর্ব্বোধ্য। কে জানে যে আমাদের ঐ এক পাপের ফলেই আমাদের এইসব দুঃখ নয়? নৈতিকতার সুউচ্চ শিখর থেকে পদস্খলন হয়ে থাকলেও ইসলামের ইতিহাসে বহু গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বর্ত্তমান। প্রাচীন গৌরবের দিনে ইসলাম পরমত-অসহিষ্ণু ছিল না। ইসলাম সমস্ত জগতের প্রশংসাভাজন হয়েছিল। পাশ্চাত্য যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল, তখন পূর্ব্বগগনে এক উজ্জ্বল তারকা দেখা দিয়ে আর্ত্তনাদক্লিষ্ট জগৎকে বিলিয়েছিল আলো ও শান্তি। ইসলাম মিথ্যাধর্ম্ম নয়। সশ্রদ্ধ চিত্তে হিন্দুরা এ সম্বন্ধে অধ্যয়ন করুন এবং তা হলে আমার মত তাঁরাও এ'কে ভাল-বাসবেন। এ দেশে যদি এর ভিতর উন্মত্ততা বা ক্লেদ ঢুকে থাকে তবে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, এর জন্য আমাদের দায়িত্বও কম নয়। হিন্দুরা যদি তাদের ঘর সামলায়, তবে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, মুসলমানরাও তাদের প্রাচীন উদার সংস্কৃতির যথাযোগ্য উত্তরাধিকারী হিসাবেই এ ডাকে সাড়া দেবে। এ ব্যাপারে চাবিকাঠি আছে হিন্দুদের হাতে। দুর্ব্বলতা এবং ভীরুতাকে আমাদের বর্জ্জন করতে হবে। আমাদের হয়ে উঠতে হবে বিশ্বাস করার উপযুক্ত সাহসী এবং তা হলেই সব শুধরে যাবে।

ইংরেজ এই দেশ ত্যাগ করলে হিন্দু এবং মুসলমান দু' দলই দেখবে যে, ইংরেজ-আগমনের পূর্ব্বে তারা যেমন শান্তিতে ছিল, তেমনি থাকাতেই উভয়ের মঙ্গল। আগে যদি স্থায়ী বিবাদ সংঘটিত হ'ত তবে দুয়ের মধ্যে কোন না কোনটি নিঃশেষ হয়ে যেত। দেশের জনসাধারণের আসল মতামতের প্রতিনিধিত্ব না করতে পারলে—ভারতে যখন সত্যকার স্বাধীনতা আসবে—তখন কংগ্রেস বা লীগের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। ব্রিটিশ বেয়নেটের অস্তিত্ব এদেশে এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেচে যে মানুষের স্বাভাবিক কর্ম্মপ্রবাহ এর ফলে রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং উৎপীড়ক এবং উৎপীড়িত উভয়েরই নৈতিক অধঃপতন ঘটেচে।

দ্বাদশ অধ্যায়

নারীজাতির পুনরভ্যুত্থান

নারীজাতির যথোপযুক্ত শিক্ষায় আমি বিশ্বাস করি, তবে আমি এও বিশ্বাস করি যে পুরুষের নকল করে বা তাদের সাথে পাল্লা দিয়ে, তারা জগতে কোনই অবদান সৃষ্টি করতে পারবে না। পাল্লা তারা দিতে পারে, তবে যত উচ্চে তারা উঠতে পারত, পুরুষের অনুকরণ করলে তা আর পারবে না। তাদের হ'তে হবে পুরুষের পরিপূরক।

বেশীর ভাগ বিধানই পুরুষ রচনা করেচে, এবং এই স্বেচ্ছায় নেওয়া কর্ত্তব্য সম্পাদন :কালে তারা যে সব সময়েই ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেচে বা অবিচার করেনি, এমন কথা বলা যায় না। নারীজাতির সেই সমস্ত কলঙ্ক, যাকে আমাদের শাস্ত্রে নারীর অত্যাবশ্যকীয় এবং সনাতন বিশেষত্ব বলে বর্ণনা করা হয়েচে, তাকে দূর করাই হবে নারীজাতির পুনরভ্যুত্থানের পথে আমাদের সর্ব্বপ্রধান প্রচেষ্টা। কে করবে এই প্রচেষ্টা এবং কি ক'রে? আমার বিনীত অভিমত এই যে, এই প্রচেষ্টার জন্য সীতা, দময়ন্তী এবং দ্রৌপদীর মত পবিত্র, দৃঢ়চেতা এবং আত্মসংযমী নারী সৃষ্টির প্রয়োজন। এই রকম নারী সৃষ্টি করতে পারলে আধুনিক কালের আমাদের ভগ্নীদের প্রভাব হবে ঠিক শাস্ত্রসমূহেরই অনুরূপ। আমাদের "স্মৃতি"-সমূহে তাদের প্রতি যে ভ্রমাত্মক ইঙ্গিত আছে, তার জন্য তখন আমরা লজ্জা অনুভব করব এবং শীঘ্রই সে সব ভুলে যাব। অতীতে এরকম বিপ্লব হিন্দু-ধর্ম্মে ঘটেচে এবং ভবিষ্যতেও ঘটবে, আর আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের স্থায়িত্বকে এই ভাবে বাড়াবে।

যে আদর্শের পরিপূর্ত্তি হ'লে আমাদের নারীসমাজের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আমরা বিবেচনা করেছি। স্বভাবতই এই আদর্শের পরিপূর্ত্তিকারী নারীর সংখ্যা হবে অতি অল্প। সুতরাং এখন দেখা যাক যে, চেষ্টা করলে সাধারণ নারী কতদূর কৃতকার্য্য হতে পারে। যত বেশী সংখ্যক নারীর চিত্তে তাদের বর্ত্তমান অবস্থার সঠিক জ্ঞানের উন্মেষ করে দেওয়াই হবে তাদের প্রথম প্রচেষ্টা। যারা বিশ্বাস করে যে, শুধু আক্ষরিক শিক্ষা মারফৎ এ প্রচেষ্টা সম্ভব তাদের সাথে আমি একমত নই। এর ভিত্তিতে কাজ করলে আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধিকে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রাখতে হবে। প্রতিপদেই আমি এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করেছি যে, অত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করার কোনই প্রয়োজন নেই। প্রথমেই আক্ষরিক শিক্ষা না দিলেও আমাদের নারী-জাতিকে তাদের বর্ত্তমান অবস্থা আমরা হৃদয়ঙ্গম করাতে পারি।

সমপরিমাণ মানসিক শক্তি বিশিষ্ট পুরুষের সাথী হচ্ছে নারী। পুরুষের যাবতীয় খুঁটিনাটি কার্য্যকলাপে অংশ গ্রহণ করার অধিকার তার আছে এবং তাদেরই সমপরিমাণ স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্যও তার বিদ্যমান। পুরুষেরই মত স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে তার সর্ব্বোচ্চ আসন রয়েচে। শুধু লেখাপড়া জানার ফলে নয়—এই হওয়া উচিত নারীর স্বাভাবিক অবস্থা। একেবারে মূর্খ ও অপদার্থ পুরুষও শুধু এক দুর্নীতিপূর্ণ প্রথার জোরে নারীর উপর এমন এক কর্ত্তৃত্ব উপভোগ করে আসচে, যার তারা যোগ্য নয় এবং যা তাদের থাকাও উচিত নয়। আমাদের নারীজাতির অবস্থা এই রকম হবার জন্য আমাদের বহু আন্দোলন অর্দ্ধপথে থেমে গেছে। আমাদের বহু প্রচেষ্টা যথোপযুক্ত ফল প্রসব করে না, কারণ আমাদের ভাগ্য হচ্চে সেই দৃষ্টিকৃপণ মূর্খ ব্যবসায়ীর মত, ব্যবসায়ে যে যথেষ্ট মূলধন লগ্নি করে না।

লেখাপড়া না জেনে বহু সৎ এবং দরকারী কাজ করা সম্ভব হলেও, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এর জ্ঞান বিনা সব সময়ে চলা সম্ভব নয়। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে এ বিকশিত এবং তীক্ষ্ণ করে এবং আমাদের সৎ কর্ম্মের শক্তিকে প্রোৎসাহিত করে। লিখতে পড়তে জানার উপর আমি কখনই অনাবশ্যক গুরুত্ব দিইনি। এর যথাযোগ্য স্থান খালি আমি দেখিয়ে দিচ্চি। বহুবার আমি বলেচি যে, অশিক্ষার অজুহাতে পুরুষের তরফ থেকে নারীর সমানাধিকারের দাবীকে অস্বীকার করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তবে এই স্বাভাবিক অধিকারগুলিকে বজায় রাখার জন্য এবং এর উন্নতি করে এর ব্যাপক প্রচারের জন্য নারীর শিক্ষা পাওয়া অপরিহার্য্য। তাছাড়া আবার যে সব লক্ষ লক্ষ নারী এ রকম শিক্ষা প্রাপ্ত নয়, তাদের খাঁটি আত্মোপলব্ধি হওয়া সম্ভব নয়। বহু পুস্তক পাঠে নির্দ্দোষ আনন্দ পাওয়া যায় এবং শিক্ষাপ্রাপ্ত না হলে এ আনন্দে আমরা বঞ্চিত থাকব। অশিক্ষিত মানুষ যে পশুর চেয়ে বিশেষ উঁচু স্তরের নয়, এ কথা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। সুতরাং যেমন পুরুষের জন্য, তেমনি নারীর জন্য শিক্ষার প্রয়োজন। অবশ্য উভয়ক্ষেত্রেই যে শিক্ষাপদ্ধতি এক প্রকারের হবে এমন কথা নয়। পুরুষের জন্য দেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা রয়েচে, তা ভ্রান্তিতে পূর্ণ এবং বহুক্ষেত্রে এতে হানিরই সৃষ্টি হয়। নরনারী উভয়েরই উচিত এ'কে পরিহার করা। এ শিক্ষা যদি বর্ত্তমানের যাবতীয় কলঙ্ক থেকে মুক্ত হয় তবুও এ'কে আমি সর্ব্বাঙ্গীণ ভাবে উপযুক্ত বলে মনে করব না। নর এবং নারী সমপর্য্যায়-ভুক্ত হলেও হুবহু এক নয়। তারা যেন এক অনুপম জোড়; পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। তারা একে অপরকে সাহায্য করে বলে একটিকে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না, এবং সেই জন্য

স্বতঃসিদ্ধ ভাবে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, যে কোন রকমে এই দুয়ের যে কোনটিরই অবস্থার বৈষম্য ঘটলে তাতে উভয়েরই সমান ভাবে হানি সাধিত হবে। স্ত্রী-শিক্ষার কোন পরিকল্পনা রচনা কালে এই অমোঘ সত্যকে সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। বিবাহিত নরনারী-যুগলের মধ্যে পুরুষের কাজ মুখ্যত বহির্জগতে। সুতরাং স্বভাবতই তার সে সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অন্যদিকে পারিবারিক জীবন আবার পূরাপূরিই নারীর আওতায়, এবং তাই গৃহস্থালীর ব্যাপারে, শিশুদের লালনপালন এবং শিক্ষা দেবার ব্যাপারে নারীর অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমি অবশ্য এ কথা বলচি না যে, জ্ঞানকে কতকগুলি পরস্পর-অসংলগ্ন বিভাগে বিভক্ত করা উচিত বা জ্ঞানের কোন বিশেষ বিভাগের দ্বার কারও কাছে রুদ্ধ থাকবে। তবে শিক্ষাপদ্ধতি এই পার্থক্যমূলক নীতির ভিত্তিতে রচিত না হওয়া পর্য্যন্ত নর বা নারী কারও জীবনের পূর্ণবিকাশ হওয়া সম্ভব নয়।

আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েচি যে, আমাদের সাধারণ জীবনে পুরুষ বা রমণী কারও ইংরেজী জ্ঞান থাকার প্রয়োজন নেই। এ কথা সত্য যে রোজগারের জন্য এবং রাজনৈতিক আন্দোলন সমূহের সাথে সক্রিয় সংযোগ রাখার জন্য ইংরেজীর দরকার আছে। রোজগারের জন্য নারীদের যে চাকরী বা ব্যবসা করা প্রয়োজন এ কথা আমি মানি না। মুষ্টিমেয় যে কয়জন নারীর ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন বা অভিপ্রায় আছে, পুরুষদের বিদ্যালয়ে যোগদান করে সহজেই তারা সে কাজ সাধন করতে পারে। নারীদের বিদ্যানিকেতনে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন করার অর্থ হচ্চে আমাদের অসহায় অবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করা। অনেককে আমি বলতে শুনেচি যে, পুরুষ এবং রমণী উভয়েরই কাছে সমান ভাবে

ইংরেজী সাহিত্যের সম্পৎশালার দ্বার খুলে দেওয়া দরকার। যথোচিত বিনয় সহকারে একথা আমি বলবই যে, তাঁদের এই মনোভাবের মধ্যে কিছু গলদ আছে। পুরুষের জন্য খুলে রেখে এই সম্পদাগারের দ্বার নারীর জন্য কেউ রুদ্ধ করতে চায় না।

সাহিত্যিক রুচি থাকলে দুনিয়ার যাবতীয় সাহিত্যের রস আস্বাদন করতে কাউকে কেউ বাধা দিতে পারে না। তবে কোন নির্দ্দিষ্ট সমাজের প্রয়োজন পূর্ত্তির জন্য কোন শিক্ষাপরিকল্পনা রচনা কালে সাহিত্যিক-রুচি-সম্পন্ন মুষ্টিমেয় কয়েক জনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। আমার স্বদেশবাসীকে ইংরেজী শিক্ষার জন্য বর্ত্তমানাপেক্ষা কম সময় ব্যয় করতে অনুরোধ করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এর থেকে তারা যে আনন্দ পেতে পারত তা থেকে তাদের বঞ্চিত করা। আমার বিশ্বাস যে, স্বাভাবিক পন্থা অনুসরণ করলে স্বল্পতর ব্যয়ে এবং কম পরিশ্রমে আমরা সমান আনন্দ উপভোগ করতে পারি। বহু অতুলনীয় সৌন্দর্য্যশীল সাহিত্যরত্নে জগৎ শোভিত; কিন্তু তার সবগুলিই ইংরেজী নয়। অন্যান্য ভাষাও অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী জানাতে পারে। এ সমস্তকেই আমাদের জনগণের নাগালের মধ্যে এনে দিতে হবে, এবং আমাদের সুধীসমাজ যখন এগুলিকে আমাদের জন্য আমাদের মাতৃভাষায় অনুবাদ করবে, তখনই সম্ভবপর হবে।

শুধু পূর্ব্বোক্ত ধরণের শিক্ষাপদ্ধতির এক খসড়া তৈরী করলেই বাল্য-বিবাহের অনর্থ দূরীভূত হবে না বা তাতে আমাদের নারীসমাজকে সমানাধিকার দেওয়া হবে না। বিয়ের পর যে সব মেয়েদের আমরা আমাদের দৃষ্টিপথ থেকে এক রকম অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখি, তাদের কথা বিবেচনা করা যাক। তারা তো আর আমাদের বিদ্যানিকেতনে প্রত্যাবর্ত্তন করবে না। বাল্যকালে মেয়ের বিয়ে দেওয়ায় যে অকথ্য এবং অচিন্তনীয় পাপাচার হয়, সে

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অনুভূতি থাকলেও মায়েরা তাঁদের মেয়েদের শিক্ষা দেবার বা অন্য কোন ভাবে তাদের নীরস জীবনে আনন্দ সঞ্চার করার কথা চিন্তাও করতে পারেন না। নিঃস্বার্থ পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রণোদিত হয়ে কেউ অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকার পাণিপীড়ন করে না, কামনাপরবশ হয়েই সে এ কাজ করে থাকে। এই সব মেয়েদের কে ত্রাণ করবে? এর উপযুক্ত উত্তর নারীজাতির যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে। কঠিন হলেও এর উত্তর মাত্র একটি। স্বামী ছাড়া এ ব্যাপারে তার আর কোন রক্ষাকর্ত্তা নেই। অপ্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রী যে স্বামীর মত-পরিবর্ত্তন করাতে পারবে এ আশা করা বৃথা। সুতরাং অন্তত বর্ত্তমানের জন্য এই কঠিন দায়িত্বভার পুরুষের উপর ছেড়ে দিতে হবে। পেরে উঠলে আমি যাবতীয় অপরিণতবয়স্কা বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা জানব এবং আমার বন্ধুদের সাথেও পরিচয় স্থাপন করব এবং খুব বিনীত নৈতিক উপদেশ দিয়ে অপরিণতবয়স্কা স্ত্রীর সাথে তাদের ভাগ্যসূত্র গ্রথিত করে তাঁরা যে মারাত্মক অপরাধ করচেন, সে সম্বন্ধে আমি তাঁদের বোঝাবার চেষ্টা করব এবং এই বলে আমি তাঁদের সতর্ক করে দেব যে যতক্ষণ না তাঁরা শিক্ষা দিয়ে তাঁদের স্ত্রীকে শুধু সন্তানধারণেরই উপযুক্ত নয়, উপযুক্তভাবে সন্তানের লালন-পালন করার যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলেন, এবং এই অন্তর্বর্ত্তী কালে যদি না তাঁরা পূর্ণ কৌমার্য্যব্রত পালন করেন, তবে যে পাপ তাঁরা করেচেন, তার যথোপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অস্পৃশ্যতার অভিশাপ

হিন্দুধর্ম্মের ভিতর আজ এক দুরপনেয় কলঙ্ক—কালিমা বিরাজমান। বহু পূর্ব্ব হতে যে এই কলঙ্ক আমাদের উপর আরোপিত হয়েচে একথা বিশ্বাস করতে আমি অপারগ। যখন আমরা একেবারে নীচে পড়ে গিয়েছিলাম, আমার বোধ হয় যে তখনই আমাদের ভিতরে এই জঘন্য দুঃখপ্রদ 'অস্পৃশ্যতা'র মনোভাব এসেছিল। এ পাপ আমাদের সাথে একেবারে লেগে আছে। আমার মনে হয়, এ যেন আমাদের প্রতি এক অভিশাপ, এবং আমাদের উপর যতদিন এ অভিশাপ থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত যেসব দুঃখ এই পবিত্র দেশ ভোগ করবে, আমার মতে সে সমস্ত হবে আমাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অমার্জ্জনীয় অপরাধসমূহের উপযুক্ত সাজা।

হিন্দুধর্ম্মে যে ভাবে আজকাল অস্পৃশ্যতাকে মানা হয়, আমার মতে তাকে মানুষ ও ঈশ্বরের প্রতি পাপাচরণ বলে অভিহিত করা উচিত। এইজন্য এ হচ্চে ঠিক বিষের মত এবং ধীরে ধীরে এই বিষ হিন্দুধর্ম্মের জীবনীশক্তিকে ফোঁপরা করে ফেলচে। আমার মতে সমগ্রভাবে বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে যে, হিন্দুশাস্ত্ররাজির সমর্থন এর পিছনে নেই। সুষ্ঠু ধরণের অস্পৃশ্যতা অবশ্য শাস্ত্রে আছে এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই এরকম পাওয়া যায়। এ হচ্চে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতি। অনন্তকাল পর্য্যন্ত এ থাকবে। তবে ভারতে যে ভাবে আজকাল আমরা অস্পৃশ্যতা মানচি, সে এক বীভৎস ব্যাপার, এবং বিভিন্ন প্রদেশ এমন কি বিভিন্ন জেলায় এর বিভিন্ন রকমের রূপ। অস্পৃশ্য এবং স্পৃশ্য উভয়েরই অধোগতি ঘটেচে এর জন্যে। প্রায় ৪০

কোটি মানুষের আত্মবিকাশ এর ফলে রুদ্ধ হয়ে গেছে। জীবনের প্রাথমিক সুখসুবিধাটুকু থেকেও তারা বঞ্চিত। সুতরাং যত শীঘ্র এই প্রথার অবসান ঘটে, ততই হিন্দুধর্ম্মের মঙ্গল, ভারতের মঙ্গল এবং বোধ হয় সমগ্র মানবসমাজের পক্ষেই তা মঙ্গলজনক।

ভারতের এক-পঞ্চমাংশকে যদি আমরা চিরদাসত্বে আবদ্ধ রাখতে চাই এবং ইচ্ছা করে যদি তাদের জাতীয় সংস্কৃতির ফল ভোগ করতে না দিই, তবে স্বরাজ শব্দটির কোন অর্থ হয় না। এই বিরাট আত্মশুদ্ধির আন্দোলনে আমরা ঈশ্বরের সহায়তা কামনা করচি আর তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে যার বেশী প্রয়োজন তাকেই মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করচি। নিজেরা অমানুষ হয়ে আমরা ভগবানের সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে অপরের অমানুষিকতার হাত থেকে আমাদের বাঁচানোর জন্য তাঁকে অনুরোধ জানাতে পারি না।

অস্পৃশ্যতা যে অতি প্রাচীন প্রথা এ কথা কেউ অস্বীকার করে না। তবে এ যদি অন্যায় হয় তবে প্রাচীনত্বের দোহাই দিয়ে এ'কে সমর্থন করা চলতে পারে না। অস্পৃশ্যরা যদি আর্য্যদের সমাজ-বহির্ভূত হয়, তবে সেই সমাজের পক্ষে এ আরও অমঙ্গলজনক কথা। আর্য্যরা তাদের প্রগতির পথে কোন সম্প্রদায়বিশেষকে সাজা দেবার জন্য তাদের সমাজ-বহির্ভূত করে দিয়ে থাকলেও তাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কারণে দণ্ডিত হয়েছিলেন সে সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা না করেই কেন যে তাদের ঘাড়েও সেই শাস্তি আরোপিত হবে তার কোন কারণ নেই।

অস্পৃশ্যদের মধ্যেও ছুঁৎমার্গের প্রচলন থাকায় শুধু এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, কুপ্রথাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা যায় না। এর সর্ব্বনাশা ফল সর্ব্ব-ব্যাপী। কি জন্য যে সংস্কৃতিসম্পন্ন হিন্দুসমাজের ত্বরান্বিত হয়ে নিজেকে এর থেকে বিমুক্ত করা উচিত অস্পৃশ্যদের মধ্যে ছুঁৎমার্গ প্রচলিত থাকা

হচ্চে তার আর একটি কারণ। জীবহত্যা করা এবং রক্ত, মাংস. অস্থি বা মলমূত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করার জন্যই যদি তারা অস্পৃশ্য হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেক চিকিৎসক এবং সেবিকারই অস্পৃশ্য হওয়া উচিত। এই অনুযায়ী প্রত্যেক খৃষ্টান, মুসলমান বা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দু খাবার জন্য বা দেবালয়ে বলি দেবার জন্য যারা জীবহত্যা করে, তারা সবাই অস্পৃশ্য। কসাইখানা, তাড়ির দোকান বা বারবনিতালয়গুলি সাধারণত পৃথক থাকে বা এদের পৃথক রাখা উচিত। তা বলে অস্পৃশ্যদেরও এমনি আলাদা রাখার স্বপক্ষে যদি আমরা এই যুক্তি দেখাই তাহলে সে হবে চূড়ান্ত পক্ষপাতিত্বের নমুনা। কসাইখানা বা তাড়ির দোকান পৃথক থাকে, থাকা উচিতও। তবে কসাই বা শুঁড়িকে পৃথক রাখা হয় না।

অস্পৃশ্যতাকে আক্রমণ করবার সময় আমি বিষয়টির একেবারে মূল পর্য্যন্ত অনুধাবন করেচি এবং সেই জন্য আমার কাছে স্বরাজের রাজনৈতিক বিধানের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের চেয়েও এর মূল্য অধিক। লক্ষ লক্ষ নিপীড়িত জনগণের হৃদয়ে যদি এই আশার সঞ্চার না করতে পারে যে তাদের পিঠের বোঝা থেকে তাদের মুক্তি দেওয়া হবে, এবং এই বিধান যদি নৈতিক শক্তির সহায়তায় পুষ্ট না হয়, তবে এ আমাদের কাছে গুরুভার-স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে।

প্রারম্ভে অস্পৃশ্যতা ছিল পরিচ্ছন্নতার নীতি এবং ভারত ছাড়া দুনিয়ার আর সব জায়গাতেও এখনও তাই আছে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বা দ্রব্য অপরিষ্কার থাকলে তাকে অস্পৃশ্য বলা হয়; কিন্তু সেই ব্যক্তি বা দ্রব্য অপরিচ্ছন্নতামুক্ত হওয়া মাত্র আর অস্পৃশ্য থাকে না। সুতরাং বেতনভুক্ ভাঙ্গীই হ'ক বা অবৈতনিক মাতাই হ'ন তাঁরা তাদের অপরিষ্কার কাজের পর, নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করা পর্য্যন্ত অপরিষ্কারই থেকে যান। ভাঙ্গীকে তাই চিরকালের জন্য অস্পৃশ্য

বিবেচনা না করে, তাকে ভাইয়ের মত ভেবে, সমাজের জন্য অপরিষ্কার কাজ করার পর তাকে পরিষ্কার হবার সুযোগ দিলে বা তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য করলে, সমাজের যে কোন অন্য সদস্যের মত তাকে গ্রহণ করা উচিত।

জাতিভেদ প্রথাকে বর্ণাশ্রম থেকে পৃথক করে দেখলেও এ'কে আমি "ঘৃণিত এবং পাপাচারপূর্ণ কুসংস্কার" বলে মনে করি না। এর দুর্ব্বলতা বা গলদ অবশ্য আছে, তবে অস্পৃশ্যতার মত পাপাচারপূর্ণ নয়। দেহের কোন কুৎসিত অঙ্গ যেমন শরীরেই অংশ বা আগাছা যেভাবে শস্যক্ষেত্রেরই একটি অঙ্গ, সেই অর্থে অস্পৃশ্যতাকেও জাতিভেদ প্রথার ফল স্বরূপ বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কুৎসিত অঙ্গের জন্য বা আগাছার জন্য যেমন শরীর বা শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা অনুচিত, তেমনি সমাজচ্যুতদের জন্য জাতিভেদ প্রথাকে ধ্বংস করা অন্যায়। তাই এই সমাজচ্যুত করার প্রথা বলতে আমরা যা বুঝি তাকে সমূলে ধ্বংস করতে হবে। এই প্রথাটি লয়প্রাপ্ত না হ'লে এ অমিতাচার দূর করা কঠিন। সুতরাং অস্পৃশ্যতাকে জাতিভেদ প্রথার ফল বলা যায় না। উচ্চ-নীচের যে পার্থক্য হিন্দুসমাজের মধ্যে ঢুকে এ'কে ক্ষয়িষ্ণু অবস্থায় এনে ফেলেচে, এ হচ্চে তারই ফল। তাই অস্পৃশ্যতার উপর আক্রমণ হচ্চে এই উচ্চনীচ মনোবৃত্তির উপর আক্রমণেরই নামান্তর মাত্র। অস্পৃশ্যতার অবসান ঘটা মাত্র জাতিভেদ প্রথাও শুচিতা লাভ করবে, অর্থাৎ আমার কল্পনা অনুযায়ী এ হয়ে উঠবে খাঁটি বর্ণধর্ম্মের প্রতীক। সমাজের চারটি বিভাগ একে অপরের পরিপূরক হবে, এর মধ্যে কোনটিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বা কোনটিকে নিকৃষ্ট বলা হবে না। হিন্দু সমাজদেহের জন্য প্রত্যেকটিই হবে সমান প্রয়োজনীয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পানাসক্তির অপকারিতা

আপনারা নিশ্চয় এই চটকদার যুক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত হবেন না যে জোর করে ভারতকে মিতপায়ী করা অনুচিত এবং সুরাসেবীদের সুরাপানের সুবিধা দেওয়া দরকার। দেশবাসীর পাপাচরণে রাষ্ট্র সহায়তা করতে পারে না। আমরা বারবনিতালয়সমূহ পরিচালনা করি না বা তার অনুমতিও দিই না। চোরের চৌর্য্যবৃত্তিকে আমরা আস্কারা দিই না। আমার মতে মদ্যপান চৌর্য্যবৃত্তি ও এমন কি বোধ হয় বেশ্যাবৃত্তির চেয়েও হানিকর। কখনও কখনও কি এই দুইই মদ্যপানাসক্তির ফলে সৃষ্ট হয় না?

পাপাচরণের চেয়ে সুরাসক্তিকে বরং একটি রোগই বলা যেতে পারে। এমন বহু লোককে আমি জানি, পারলে যারা সানন্দে মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে। এমনও অনেককে আমি জানি যারা এই প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হ'ক বলে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেচে, তাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী এই প্রলোভনকে দূরে সরিয়ে দিয়েও দেখা গেছে যে গোপনে তারা মদ্যপান করচে। তবে অবশ্য এ কথা আমি বলচি না যে প্রলোভনের কারণকে সরিয়ে দেওয়া অনুচিত। নিজের কাছ থেকেই যাতে রোগীরা আত্মরক্ষা করতে পারে, সে বিষয়ে তাদের সাহায্য করা দরকার।

শ্রমিকদের সাথে নিজেকে একাত্ম করার ফলে আমি জানি যে পানাসক্ত শ্রমিকদের সংসারে মদের ফলে কি ভীষণ সর্ব্বনাশই না হয়েচে। এও আমি জানি যে সহজে না পাওয়া গেলে তারা মদ্য স্পর্শই করত না। সমসাময়িক এমন

বহু উদাহরণ আমাদের কাছে আছে যে বহু ক্ষেত্রে মদ্যপায়ীরাই মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করতে চেয়েচে।

পানাসক্তি মানুষের আত্মার বিলোপ ঘটায়, এবং তাকে এমন পশুতে পরিণত করার চেষ্টা করে, স্ত্রী, মাতা এবং ভগ্নীর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে যে অক্ষম। এমন অনেককে আমি দেখেচি যে মদের নেশায় পড়ে তারা এদের পার্থক্য ভুলে যায়।

বহুক্ষেত্রে মদ্যপানের অপকারিতা নিঃসন্দেহেই ম্যালেরিয়া ইত্যাদি দ্বারা অনুষ্ঠিত অনিষ্টের চেয়েও ভয়ঙ্কর। ম্যালেরিয়া ইত্যাদি শুধু দেহেরই অনিষ্ট করে, আর পানাসক্তি দেহ মন দুই-এরই ধ্বংস সাধন করে।

আমাদের মধ্যে সহস্র সহস্র সুরাসেবী থাকার চেয়ে ভারতকে বরং ভিক্ষুকে পরিণত করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করব। যদি প্রয়োজন হয়, সুরা বর্জ্জন করার জন্য ভারত বরং অশিক্ষিত থাকুক তাও স্বীকার।

পানদোষের কবলে যে জাতি পড়েচে, ধ্বংস ছাড়া তাদের আর কোন গতি নেই। এই অভ্যাসের জন্য বহু রাজ্যের ধ্বংস হয়ে যাবার নজির ইতিহাসে বিদ্যমান। ভারতে আমরা দেখেচি যে, ঐ অভ্যাসের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বংশের মত বিরাট বংশও ধ্বংস হয়ে গেল। রোমের পতনের একটি আংশিক কারণ হচ্চে এই ভীষণ অপরাধ।

আমাদের মধ্যে অতি অল্প কয়েকজন সুরাসক্ত বলে অন্যান্য দেশের চেয়ে ভারতে মদ্য বর্জ্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মদ্যপানকে সাধারণত অসম্মানকর বলে বিবেচনা করা হয়। আর আমার বিশ্বাস যে দেশে এমন বহু লোক আছে যারা সুরা পান যে কি তাই জানে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

নয়িতালিম

এই বুভুক্ষু জনসাধারণের দেশে আমার মতে বুদ্ধির সাথে খাটতে শেখানোই হচ্চে একমাত্র প্রাথমিক এবং প্রাপ্তবয়স্কের শিক্ষা। দৃশ্যত যে প্রকৃতিদত্ত জিনিষটির জন্য মানুষ এবং পশুর পার্থক্য বোঝা যায়, সে হচ্চে মানুষের হাত, এবং কেতাবী শিক্ষার উচিত হচ্চে এই হাতের শিক্ষারই পদাঙ্ক অনুসরণ করা। লিখতে পড়তে না জানলে যে মানুষের পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব নয়, এ এক কুসংস্কার মাত্র। সে জ্ঞান অবশ্যই জীবনের সম্পদের বৃদ্ধি করে, তবে মানুষের নৈতিক শারীরিক বা আধিভৌতিক উন্নতির জন্য এ'কে কোনমতেই অপরিহার্য্য বলা যেতে পারে না।

বনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্চে হাতের কাজ দ্বারা শিশুর শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতি সাধন করা। তবে আমার ধারণা হচ্চে এই যে, যে কোন পরিকল্পনা, যদি শিক্ষার দিক থেকে সুষ্ঠু এবং সুনিয়ন্ত্রিত হয়, তবে তার অর্থ নৈতিক বনিয়াদও পোক্ত হ'তে বাধ্য। উদাহরণ স্বরূপ শিশুদের আমরা ক্ষণভঙ্গুর মাটির খেলনা তৈরী করতে শেখাতে পারি। এতেও তাদের মানসিক বৃত্তির উৎকর্ষ সাধিত হবে। তবে মানুষের শ্রম বা কাঁচা মালের যে অপচয় করা উচিত নয়, বা এগুলিকে যে বিফলে যেতে দেওয়া সঙ্গত নয়, এই গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক তথ্যকে এতে অবহেলা করা হবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত যে প্রত্যেকের প্রয়োজনে লাগানো উচিত, এই নীতির প্রতি জোর দেওয়াই হচ্চে নাগরিকতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা এবং এর ফলে স্বভাবতই বনিয়াদি শিক্ষা স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

বুদ্ধিবৃত্তির খাঁটি বিকাশ যে হাত, পা, চোখ, কান, নাক ইত্যাদি দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের শিক্ষা এবং সঞ্চালন দ্বারাই হ'তে পারে এই আমার ধারণা। অর্থাৎ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির শ্রেষ্ঠ এবং দ্রুততম বিকাশের উপায় হচ্চে তার দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহকে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজে লাগানো। চিত্তবৃত্তির বিকাশের সাথে সাথে যদি শরীর ও মনের যুগপৎ উন্নতি সাধিত না হয়, তবে শুধু মনের বিকাশ এক অকিঞ্চিৎকর একতরফা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অন্তরের বিকাশই হচ্চে আমার কাছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা। সুতরাং শিশুর দৈহিক এবং আধ্যাত্মিক প্রতিভার সাথে যখন যুগপৎ তার মনেরও শিক্ষা হয়, তখনই তার মনের সর্ব্বাঙ্গীণ এবং সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভব। সম্মিলিতভাবে এগুলি এক অদৃশ্য অথচ অবিচ্ছেদ্য সত্তা। এগুলি যে একক ভাবে বা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক না রেখেই বিকশিত হতে পারে, এ ধারণা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিতান্ত ভ্রমাত্মক।

শরীর, মন এবং আত্মার বিভিন্ন বৃত্তিগুলির সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় না থাকায় বিষময় ফল আজ সুস্পষ্ট। এর সব কয়টিই আমাদের মধ্যে আছে; শুধু আমাদের উন্মার্গগামী পরিবেশের জন্য এদের অস্তিত্বের কথা আমরা বিস্মৃত হয়েচি।

শুধু বুদ্ধিবৃত্তি বা বিরাট দেহটি কিংবা হৃদয় বা আত্মাই মানুষের একমাত্র পরিচয় নয়। গোটা মানুষটি সৃষ্টি করতে হলে এই তিনটি বৃত্তির যথোপযুক্ত সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন এবং এই ভাবেই সম্ভব শিক্ষার খাঁটি অর্থনীতি রচনা করা।

শারীরিক শ্রমই হবে সমগ্র বিষয়টির মূল কেন্দ্র। শারীরিক শ্রমের শিক্ষা দ্বারা বিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা সাজানোর উপযোগী দ্রব্যরাজি বা অপ্রয়োজনীয় খেলনা ইত্যাদি বানানো হবে না। এমন জিনিষ তৈরী করতে হবে, বাজারে

যা চলে। আগের কালের কারখানার চাবুকের ভয়ে ভীত শিশুদের মত তারা এ কাজ করবে না। এতে আনন্দ পাবে এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রোৎসাহিত হবে বলেই এ কাজ তারা করবে।

ভারতে নিঃশুল্ক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া উচিত, এই নীতিতে আমি দৃঢ় বিশ্বাসী। সাথে সাথে আমার এও বিশ্বাস যে শিশুদের কোন প্রয়োজনীয় কাজ শিখিয়ে, সেইটিকে তাদের মানসিক, শারীরিক, এবং আধ্যাত্মিক প্রতিভার বিকাশের জন্য প্রয়োগ করে আমরা এই নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি। এতে আমাদের গ্রামগুলির ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষয়ের গতি রুদ্ধ হবে। এর ফলে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত এমন এক সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত হবে, যেখানে "স্বত্ববান" এবং "নিঃস্বদের" ভিতর বর্ত্তমানের মত কোন কৃত্রিম পার্থক্য থাকবে না এবং প্রত্যেকেরই জীবন-ধারণোপযোগী জীবিকা এবং স্বাধীনতা পাবার অধিকার থাকবে।

গ্রাম্য কুটিরশিল্প যথা সূতা কাটা, তুলা ধুনাই করা ইত্যাদি মারফৎ প্রাথমিক শিক্ষা দেবার আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তাকে সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ এক নিঃশব্দ সামাজিক বিপ্লবের অগ্রদূত বলে মনে করা যেতে পারে। এর ফলে গ্রাম ও নগরের মধ্যে এক সাবলীল নৈতিক সম্বন্ধ স্থাপিত হবে, আর আধুনিক সমাজের বিপৎসঙ্কুল অবস্থা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিরাজিত বিষাক্ত সম্পর্ক দূর করার পথে বহুল পরিমাণে এ সাফল্য অর্জ্জন করবে।

ষোড়শ অধ্যায়

রাষ্ট্রভাষা এবং লিপি

আমি বিশ্বাস করি যে,

১। হিন্দি, হিন্দুস্থানী এবং উর্দু এই কথাগুলি হচ্চে একটি মাত্র ভাষারই বিভিন্ন নাম, যা উত্তরের হিন্দু বা মুসলমানেরা ব্যবহার করে থাকেন এবং এ'কে দেবনাগরী বা পার্শিয়ান যে কোন লিপিতেই লেখা যায় ;

২। উর্দু কথাটি প্রচলিত হবার আগে, হিন্দু মুসলমান উভয়ের ব্যবহৃত এই ভাষার নাম ছিল হিন্দি ;

৩। এই একই ভাষাকে পরে (এর সময় আমার জানা নেই) হিন্দুস্থানী নামে অভিহিত করা হয় ;

৪। উত্তরের এক বিরাট জনসমষ্টি যে ভাষা বুঝতে পারে, হিন্দু ও মুসলমানদের সেই ভাষায় কথা বলতে শেখা উচিত ;

৫। সেই সঙ্গে আবার নির্ব্বিচারে বহু হিন্দু ও মুসলমান যথাক্রমে সংস্কৃত এবং পার্শিয়ান বা আরবি শব্দ ব্যবহার করতে চাইবেন। যতদিন পর্য্যন্ত পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং পৃথক থাকার ভাব থাকবে, ততদিন এসব আমাদের বরদাস্ত করতে হবে। যে সব হিন্দু, মুসলিম-চিন্তাধারা সম্বন্ধে কিছু জানতে চান, তাঁরা পার্শিয়ান লিপিতে লেখা উর্দু পড়বেন ; এবং হিন্দু-চিন্তাধারার কিছু পরিচয় পেতে ইচ্ছুক হ'লে, মুসলমানদের দেবনাগরী লিপিতে লেখা হিন্দি পড়তে হবে ;

৬। শেষ পর্য্যন্ত যখন একাত্ম হয়ে প্রাদেশিকতা বর্জ্জন করে, ভারতকে আমরা নিজদেশ মনে করে গর্ব্ব অনুভব করব, এবং একই গাছের এই বিভিন্ন

ফলগুলিকে যখন আমরা চিনব, ব্যবহার করব এবং যখন এর রসাস্বাদন করব, প্রদেশের কাজের জন্য তখন প্রাদেশিক ভাষা বজায় রেখেও আমরা একই লিপি সম্বলিত একটি মাত্র রাষ্ট্রভাষা ব্যবহার করব ;

৭। কোন প্রদেশ, জেলা বা কোন একদল লোকের উপর কোন এক বিশেষ ধরণের হিন্দি বা লিপি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া দেশের স্বার্থের ভীষণ পরিপন্থী হবে ;

৮। সাধারণ ভাষার ব্যাপারটিকে ধর্ম্মের পার্থক্য থেকে আলাদা করে দেখতে হবে ;

৯। রোমান লিপি ভারতের সাধারণ লিপি হতে পারে না বা হওয়া উচিত নয়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুধু পার্শিয়ান এবং দেবনাগরী লিপির মধ্যে হতে পারে। দেবনাগরীর নিজস্ব স্বাভাবিক যোগ্যতার কথা ছেড়ে দিলেও, সারা ভারতের জন্য এইটিকেই সাধারণ লিপির মর্য্যাদা দেওয়া উচিত, কারণ বেশীর ভাগ প্রাদেশিক লিপিই সৃষ্ট হয়েচে দেবনাগরী থেকে এবং তাদের পক্ষে এইটি শেখাই সবচেয়ে সহজ। সাথে সাথেই মুসলমান বা অন্য যারা জানে না, তাদের মধ্যে জোর করে এটি চালানোর কোন রকম প্রচেষ্টাই হওয়া উচিত নয়।

১০। উর্দুকে যদি হিন্দি থেকে পৃথক ধরা হয়, তবে আমি বলব যে আমি উর্দুরও সেবা করেচি, কারণ ইন্দোরের অধিবেশনে হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন আমারই কথামত প্রথম ধারায় উল্লিখিত এর সংজ্ঞা গ্রহণ করে এবং নাগপুরে ভারতীয় সাহিত্য পরিষদ আমার কথামত এই সংজ্ঞা গ্রহণ করে আন্তঃ-প্রাদেশিক ভাব বিনিময়ের এই সাধারণ ভাষাকে হিন্দি বা হিন্দুস্থানী আখ্যায় অভিহিত করে। এই ভাবে হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সাধারণ ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করার এবং উক্ত ভাষায় প্রাদেশিক চিন্তাধারা সমূহের সেরা জিনিষ অনুপ্রবিষ্ট করানোর পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়েচে।

রোমান লিপি ?

বর্ত্তমান অবস্থায় মুসলমানরা যে দেবনাগরীর উপর জোর দেবে একথা মনে আনা যায় না। বিপুলসংখ্যক হিন্দুরা যে আরবি লিপি গ্রহণ করানোর জন্য পীড়াপীড়ি করবে একথা আরও অভাবনীয়। "দেবনাগরী বা পার্শিয়ান যে কোন লিপিতেই লিখিত হ'ক না কেন, উত্তরের হিন্দু এবং মুসলমানরা সাধারণত যে ভাষা ব্যবহার করে থাকেন", তাকেই আমি তাই হিন্দি বা হিন্দুস্থানীর সংজ্ঞা হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেচি। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হলেও আমি সেই সংজ্ঞাই মেনে চলি। তবে নিঃসন্দেহেই একটি দেবনাগরী আন্দোলনের সাথে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে জড়িত। বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত ভাষাসমূহ, বিশেষত শব্দভাণ্ডারে যাদের বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ আছে, সেগুলির সাধারণ লিপি হিসাবে দেবনাগরীর প্রবর্ত্তন করাই সে আন্দোলনের উদ্দেশ্য। যাই হোক দেবনাগরী লিপিতে ভারতের যাবতীয় ভাষার মহামূল্য সম্পদরাজি আহরণের একটা প্রচেষ্টা চলচে।

সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত বা এর সাথে ঘনিষ্ঠভাকে সম্পর্কিত ভাষাগুলির জন্য একটি সাধারণ লিপি থাকা উচিত, আর দেবনাগরীই হওয়া উচিত সে লিপি। কোন এক প্রদেশবাসীর অন্য প্রদেশের ভাষা শেখার পক্ষে বিভিন্ন লিপিগুলি এক অহেতুক বাধা স্বরূপ। এমন কি ইউরোপ, এক-জাতি-অধ্যুষিত না হওয়া সত্ত্বেও মোটামুটি একটি লিপিকেই গ্রহণ করেচে। ভারত এক-জাতিত্বের দাবী করা সত্ত্বেও এবং বস্তুত ভারতবাসী এক জাতি হওয়া সত্ত্বেও ভারতে কেন একটি মাত্র লিপি প্রবর্ত্তিত হবে না? একই ভাষার জন্য আমি দেবনাগরী এবং উর্দু দুটি লিপিকেই প্রশ্রয় দেওয়ায়, আমি জানি যে আমার এই কথা সামঞ্জস্যবিহীন মনে হ'তে পারে। তবে আমার এ সামঞ্জস্যবিহীন আচরণ একেবারে মূর্খতাপ্রসূত নয়। বর্ত্তমানে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব রয়েচে।

যতদূর সম্ভব পরমতসহিষ্ণু হওয়া এবং পরস্পরের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মানভাব পোষণ করাই হচ্চে শিক্ষিত হিন্দু এবং মুসলমানদের বিজ্ঞজনোচিত এবং আবশ্যকীয় কর্ত্তব্য। তাই দেবনাগরী বা উর্দ্দু লিপির যে কোন একটিকে বেছে নেবার অধিকার দেওয়া হয়েচে। সৌভাগ্যবশত প্রদেশগুলির মধ্যে কোন ঝগড়া নেই। সুতরাং একাধিক উপায়ে যাতে প্রদেশসমূহের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপিত হতে পারে সে রকম সংস্কার সাধিত হওয়া প্রয়োজন। একথা মনে রাখতে হবে যে দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই নিরক্ষর। শুধু বাজে ভাবপ্রবণতার জন্য বা চিন্তাশক্তির দুর্ব্বলতার জন্য তাদের উপর নানা রকম লিপি চাপিয়ে দিলে সে হবে আত্মঘাতী নীতি।

আমি শুনেচি যে আসামের কোন কোন উপজাতিদের দেবনাগরীর বদলে রোমান লিপিতে লিখতে পড়তে শেখান হচ্চে। আগেই আমি বলেচি যে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত হয়েই হ'ক বা বর্ত্তমান রূপেই হ'ক দেবনাগরীই হচ্চে একমাত্র লিপি যা ভারতে সর্ব্বজনগ্রাহ্য হওয়া সম্ভব। স্বেচ্ছায় মুসলমানরা শুধু বৈজ্ঞানিক কারণে বা জাতীয় প্রয়োজনের খাতিরে দেবনাগরীর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার না করা পর্য্যন্ত উর্দ্দু বা পার্শিয়ান যুগপৎ এর সাথে চলতে থাকবে। তবে বর্ত্তমান সমস্যার সঙ্গে এর সম্বন্ধ নেই। রোমান লিপি অন্য দুটির সাথে একযোগে চলতে পারে না। রোমান লিপির উৎসাহী সমর্থকেরা দুটিকেই স্থানচ্যুত করবে। কিন্তু জনসাধারণের হৃদয়াবেগ বা বিজ্ঞান দুইই এর প্রতিকূল। ছাপা এবং যন্ত্রলিখনের কাজে এর সুবিধাই হচ্চে এর একমাত্র যোগ্যতা। তবে এ শিখতে জনসাধারণের উপর যে চাপ পড়বে, তার তুলনায় এ সুবিধা কিছুই নয়। নিজের প্রাদেশিক লিপি বা দেবনাগরীতে যে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ নিজ ভাষায় অধ্যয়ন করে, এ লিপি তাদের কোন কাজেই লাগবে না। প্রাদেশিক লিপি-গুলি দেবনাগরী থেকে উদ্ভূত বলে দেশের লক্ষ লক্ষ হিন্দু এমন কি মুসলমানদের

পক্ষেও দেবনাগরী শেখা অপেক্ষাকৃত সহজ। জেনেশুনেই আমি মুসলমানদের এর অন্তর্ভুক্ত করেছি। উদাহরণ স্বরূপ, বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা হচ্চে বাঙলা। আবার তামিলি মুসলমানদের মাতৃভাষাও হচ্চে তামিল। আজকালকার উর্দু প্রচারের আন্দোলনের ফল স্বভাবতই এই হবে যে সমগ্র ভারতের মুসলমানরা নিজেদের মাতৃভাষা ছাড়াও উর্দু শিখবে। পবিত্র কোরাণ অধ্যয়ন করার জন্য অবশ্য তাদের আরবি শিখতে হবে। কিন্তু একমাত্র ইংরেজী শিখতে ইচ্ছুক না-হওয়া পর্যান্ত হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের কখনই রোমান লিপি জানার প্রয়োজন ঘটবে না। স্বীয় ধর্ম্মের মূল গ্রন্থ পঠনেচ্ছুক হিন্দুদেরও তেমনি দেবনাগরী লিপি শিখতে হয় এবং তাঁরা শেখেনও। এই জন্য দেবনাগরীকে সর্ব্বজনগ্রাহ্য করার আন্দোলনের যথার্থ কারণ রয়েচে। রোমান লিপির প্রবর্ত্তন হচ্চে জোর করে একটা কিছু চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা এবং এ প্রচেষ্টা কখনও জনপ্রিয় হবে না। জনসাধারণের মধ্যে সত্যকার চেতনার অভ্যুত্থান এইসব জোর করে একটা কিছু চাপিয়ে দেবার যাবতীয় প্রচেষ্টার অস্তিত্ব মুছে ফেলবে। আর এ গণচেতনার অভ্যুত্থান আসচে। আমাদের যে কোন কারও কাছে বিদিত কারণের চেয়েও দ্রুতগতিতে এ আসচে। জনজাগৃতির জন্য সময় অবশ্য যথেষ্টই লাগে। এ'কে নিজেরা সৃষ্টি করা যায় না। রহস্যজনক ভাবে এ আসে বা যেন আসচে বলে মনে হয়। গণচিত্তকে পূর্ব্বগামী করে জাতীয় কর্ম্মীরা শুধু এ'কে ত্বরান্বিত করতে পারেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

ইংরেজীর স্থান

আমার সুচিন্তিত অভিমত এই যে, যে ভাবে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হয়েচে, তাতে ইংরেজীশিক্ষিত ভারতীয় সম্প্রদায় নির্বীর্য্য হয়ে পড়েচেন এবং ভারতীয় ছাত্রদের স্নায়ুর শক্তির উপর এর ফলে বিশেষ চাপ পড়েচে ও আমরা অনুকরণ-প্রিয় হয়ে পড়েচি। মাতৃভাষাকে স্থানচ্যুত করার পদ্ধতিকে, ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসের একটি দুঃখজনক অধ্যায় বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। প্রথমেই যদি ইংরেজীতে চিন্তা করার এবং মুখ্যত চিন্তাধারাকে ইংরেজীতে প্রকাশ করার বিপত্তির সম্মুখীন তাঁদের না হতে হ'ত তবে রাম-মোহন রায় আরও বড় সংস্কারক হতেন এবং লোকমান্য তিলকও হতেন আরও বড় পণ্ডিত। জনসাধারণের উপর তাঁদের প্রভাব অবশ্য বিস্ময়কর। তবে আর একটু কম অস্বাভাবিক অবস্থায় যদি তাঁরা মানুষ হতেন, তবে সে প্রভাব হ'ত আরও বেশী। ইংরেজী সাহিত্যের সুসমৃদ্ধ রত্নভাণ্ডারের জ্ঞানদ্বারা নিঃসন্দেহেই তাঁরা উপকৃত হয়েছিলেন; কিন্তু নিজেদের মাতৃভাষা মারফৎ এ জ্ঞান তাঁদের আয়ত্তাধীন হতে পারত। একদল অনুবাদকের সৃষ্টি করে কোন জাতি গড়ে উঠতে পারে না। ভেবে দেখুন, বাইবেলের প্রামাণ্য অনুবাদ না থাকলে ইংরেজদের কি হ'ত? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে চৈতন্য, কবীর, নানক, গুরুগোবিন্দ সিং, শিবাজী এবং প্রতাপ ইত্যাদি রামমোহন রায় বা তিলকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আমি জানি যে কারও সঙ্গে কারও তুলনা করা অবাঞ্ছনীয়, নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবাই মহান, তবে জনসাধারণের উপর রামমোহন বা তিলকের কথা নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে সেই ভাগ্যবানদের মত

তাঁদের প্রভাব তত স্থায়ী বা সুদূরপ্রসারী নয়। তাঁদের যে সব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল, সে নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে তাঁরা ছিলেন যেন অসুরের মত এবং তাঁদের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রথার দোষে যদি বাধার মধ্যে তাঁদের না জড়িয়ে পড়তে হ'ত তবে উভয়েই তাঁরা আরও সাফল্য অর্জ্জন করতেন। ইংরেজীভাষা জানা না থাকলে যে রাজা রামমোহন বা লোকমান্যের চিন্তাধারা ঐ রকম হ'ত না, এ কথা মানতে আমি রাজী নই। স্বাধীনতার ভাবধারা মনের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করানোর জন্য এবং চিন্তাধারার যথার্থতার জন্য যে ইংরেজীর জ্ঞান অপরিহার্য্য, এই কুসংস্কার ভারতে প্রচলিত যাবতীয় কুসংস্কারের অন্যতম। এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে দেশে একটি মাত্র শিক্ষাপ্রথা ছিল এবং একটি মাত্র ভাবের অভিব্যক্তির মাধ্যমকে জোর করে দেশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই আজকালকার বিদ্যালয় বা কলেজের শিক্ষা না পেলে আমরা যে কি হ'তাম তা প্রমাণ করার মত তথ্য আমাদের কাছে নেই। তবে এ কথাও আমরা জানি যে পঞ্চাশ বছর আগেকার চেয়ে ভারতবর্ষ আজ দরিদ্র, আত্মরক্ষার শক্তি আজ তার কম এবং তার সন্তানসন্ততির জীবনীশক্তিও আগের চেয়ে কমে গেছে। শাসনব্যবস্থার গলদের জন্যই যে এই অবস্থা হয়েচে, এ কথা আমাকে বলা নিষ্প্রয়োজন। শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটিই এর প্রধানতম কারণ। ভুলের মধ্যেই এর সূত্রপাত এবং সৃষ্টি, কারণ ইংরেজ শাসকরা ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতিকে সত্য সত্যই অকার্য্যকরী ভাবতেন। পাপের মধ্যেই এ'কে লালন পালন করা হয়েচে, কারণ এর উদ্দেশ্যই ছিল ভারতের দেহ, মন এবং আত্মাকে খর্ব্ব করা।

ব্যবসায়িক এবং তথাকথিত রাজনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরে আজ ইংরেজী পড়া হয়। ছেলেরা ভাবে (অবশ্য এর সঙ্গত কারণ আছে) যে ইংরেজী ছাড়া তারা সরকারী চাকরী পাবে না। মেয়েদের ইংরেজী শেখান হয় বিয়ের

ছাড়পত্র পাবার জন্য। এমন কয়েকটি উদাহরণ আমি জানি যেখানে ইংরেজ-দের সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলতে পারবে বলে মেয়েরা ইংরেজী শিখতে অভিলাষী। নিজের এবং স্বীয় বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে স্ত্রী ইংরেজীতে কথা বলতে পারে না বলে মনঃক্ষুণ্ণ অনেক স্বামীকে আমি জানি। এমন অনেক পরিবারের কথা আমি জানি যেখানে ইংরেজীকে মাতৃভাষা করার প্রচেষ্টা চলেচে। শত শত যুবকের বিশ্বাস যে ইংরেজীতে জ্ঞান ছাড়া ভারতের মুক্তি এক রকম অসম্ভব। সমাজে এমনভাবে ঘুণ ধরেচে যে বহুস্থলে ইংরেজীতে জ্ঞান থাকাই হচ্চে শিক্ষার একমাত্র অর্থ। আমার কাছে এ সবই হীনতা এবং দাস-ত্বের লক্ষণ। প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে যে ভাগে ধ্বংস করা হচ্চে এবং শুকিয়ে মেরে ফেলা হচ্চে তা আমার কাছে অসহ্য। নিজের মাতৃভাষার নয়, ইংরেজীতে পিতা পুত্রকে এবং স্বামী তার স্ত্রীকে চিঠি লিখবেন, একথা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।

নিজের ঘরের চতুর্দ্দিকে দেওয়াল তুলে দিয়ে আমি জানালাগুলি বন্ধ করে দিতে চাই না। সমস্ত দেশের সংস্কৃতি যতদূর সম্ভব বিনা বাধায় আমার ঘরের চারিদিকে সঞ্চালিত হ'ক এ আমি চাই। তবে কেউ যে নিজের পায়ের নীচের মাটি থেকে আমায় উৎখাত করবে, তাতে আমি রাজী নই। অবাঞ্ছিত অতিথি, ভিক্ষুক বা ক্রীতদাস হয়ে অন্যের ঘরে আমি থাকতে রাজী নই। বৃথা গর্ব্ব করার জন্য বা অনিশ্চিত সামাজিক সুবিধা পাবার জন্য আমার ভগ্নীদের উপর ইংরেজী শেখাবার জন্য অহেতুক চাপ দিতে আমি গররাজী। সাহিত্যিক রুচিসম্পন্ন আমাদের যুবক যুবতীরা যত খুসী ইংরেজী বা দুনিয়ার অন্যান্য ভাষা শিখতে পারেন এবং তার পর একজন বসু, রায় বা ঠাকুরের মত তাঁদের জ্ঞানের দ্বারা ভারতকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারেন। তবে একজন ভারতবাসীকেও আমি তার মাতৃভাষাকে ভুলতে, অবহেলা করতে বা তার জন্য লজ্জা অনুভব

করতে দেব না, আর কেউ যে তার নিজের মাতৃভাষায় শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারা সমূহ প্রকাশ করতে অসমর্থ এ কথাও আমি তাদের অনুভব করতে দেব না। কারাগারের ধর্ম্ম আমার নয়। ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিটিরও স্থান এখানে আছে। তবে এ হচ্চে রূঢ়তা এবং জাতিগত ধর্ম্মগত ও বর্ণগত গর্ব্বের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য বর্ম্ম স্বরূপ।

দেশের যুবসম্প্রদায়ের উপর এই সর্ব্বনাশা বিদেশী মাধ্যম চাপিয়ে দেওয়া বিদেশী শাসনের বহুবিধ অন্যায়ের মধ্যে একটি অন্যতম প্রধান অন্যায় বলে ইতিহাসে পরিগণিত হবে। জাতির উদ্যম এতে ধ্বংস হয়েচে এবং ছাত্রদের আয়ু হয়েচে এর ফলে সংক্ষিপ্ত। এর ফলে তারা হয়ে পড়েচে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং শিক্ষা হয়েচে অহেতুক ব্যয়বহুল। এই পদ্ধতির উপর এখনও যদি জোর দেওয়া হয়, তবে আশঙ্কা হয় যে জাতির আত্মাকে এ ধ্বংস করবে। তাই যতশীঘ্র শিক্ষিত ভারত বিদেশী মাধ্যম রূপ এই মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়, জনসাধারণ এবং তাঁদের নিজেদেরও ততই মঙ্গল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ছাত্রদের জন্য একটি কার্য্যক্রম

১। দলগত রাজনীতিতে ছাত্ররা কোনক্রমেই অংশ গ্রহণ করবে না, তারা হচ্ছে বিদ্যার্থী এবং তথ্যঅন্বেষক, রাজনীতিবিদ্ নয়।

২। রাজনৈতিক কারণে ধর্ম্মঘট করা তাদের উচিত হবে না। নেতা অবশ্য তাদের থাকবে, তবে নেতার প্রতি তারা অনুরাগ দেখাবে তাঁর সংগুণাবলীর অনুকরণ করে। তাদের নেতাকে জেলে দিলে বা নেতা মারা গেলে বা এমন কি তাঁর ফাঁসি হলেও তারা ধর্ম্মঘট করবে না। দুঃখ যদি তাদের অসহ্য মনে হয়, এবং সমস্ত ছাত্রের বুকেই সমানভাবে বাজে, সে ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের সম্মতি নিয়ে বিদ্যালয় বা কলেজ বন্ধ করা যেতে পারে। অধ্যক্ষ কর্ণপাত না করলে যথোচিত শিষ্টাচার সহকারে ছাত্রেরা বিদ্যানিকেতন ছেড়ে চলে যেতে পারে এবং কর্ত্তৃপক্ষ অনুতাপ প্রকাশ করে তাদের পুনরায় না ডেকে পাঠানো পর্য্যন্ত তারা ফিরে আসবে না। বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছাত্র বা কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কখনই তারা বলপ্রয়োগ করবে না। এ বিশ্বাস তাদের থাকা চাই যে সংহতি সম্পন্ন হলে এবং তাদের আচরণ সৌজন্যপূর্ণ হলে তাদের বিজয় অনিবার্য্য।

৩। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তারা ত্যাগের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুতো কাটবে। তাদের সাজসরঞ্জাম সর্ব্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো-গোছানো থাকবে। সম্ভব হলে তারা নিজেরাই সে সব তৈরী করবে। স্বভাবতই তাদের সুতো খুব উঁচু দরের হবে। সুতো কাটার আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় দিকগুলির সম্বন্ধে যে সব বই আছে, তারা সেগুলি পড়বে।

৪। তারা আগাগোড়া খাদি ব্যবহার করবে এবং কলে তৈরী বা বিদেশী জিনিষের বদলে গ্রাম্যপণ্য ব্যবহার করবে।

৫। অপরের উপর তারা "বন্দেমাতরম" বা "জাতীয় পতাকা" জোর ক্'রে চাপাবে না। জাতীয় পতাকার ছবিযুক্ত প্রতীক তারা নিজেরা ব্যবহার করতে পারে তবে অপরকে অনুরূপ প্রতীক ব্যবহারের জন্য চাপ দেবে না।

৬। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বাণী তারা নিজেরা বহন করবে এবং তাদের মনে সাম্প্রদায়িকতা বা ছুঁৎমার্গের ভাব থাকবে না। প্রিয়জনের মত নিজেরা অন্যধর্ম্মাবলম্বী এবং হরিজন ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করবে।

৭। আহত প্রতিবেশীর প্রাথমিক পরিচর্য্যা অবশ্যই তারা করবে, এবং নিকটস্থ গ্রামে তারা সাফাই এবং আবর্জ্জনা পরিষ্কারের কাজ করবে ও গ্রামের শিশু ও বয়স্কদের তারা শিক্ষা দেবে।

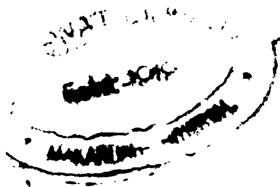
৮। রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী তারা সবাই শিখবে এবং এর বর্ত্তমান যুগ্মরূপ অর্থাৎ দু'ধরণের কথন ও লিখন পদ্ধতিও তারা জানবে। এর ফলে হিন্দি বা উর্দু যাই বলা হ'ক না কেন এবং নাগরী ও উর্দু যে কোন লিপিই লেখা হ'ক না, তারা কোন অসুবিধা ভোগ করবে না।

৯। নতুন কিছু যা তারা শিখবে, তা তারা মাতৃভাষায় অনুবাদ করবে এবং নিকটস্থ গ্রামগুলিতে সাপ্তাহিক ভ্রমণের সময় সেই নতুন জ্ঞান ছড়িয়ে দেবে।

১০। কোন কিছুই তারা গোপন করবে না, তাদের যাবতীয় আচরণ খোলাখুলি হবে। তারা আত্মসংযমমূলক পবিত্র জীবন যাপন করবে, সমস্ত ভয় বিসর্জ্জন দেবে ও সহপাঠী দুর্ব্বল ছাত্রদের রক্ষা করার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবে, এবং জীবন পণ করেও অহিংস পন্থায় দাঙ্গা দমনের জন্য তারা তাদের বিদ্যানিকেতন ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ও প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবে।

১১। সহপাঠিনী ছাত্রীদের সঙ্গে তারা যথোচিত ন্যায়সঙ্গত ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করবে।

ছাত্রদের যে কার্য্যক্রম আমি ছকে দিয়েছি, তাকে কার্য্যে পরিণত করার জন্য তাদের সময় করে নিতে হবে। আমি জানি যে কুড়েমি করে তারা বহু সময় নষ্ট করে। প্রকৃত মিতাচারের ফলে তারা সময় বাঁচাতে পারে। তবে কোন ছাত্রের উপর আমি অসঙ্গত চাপ দিতে চাই না। কোন দেশপ্রেমিক ছাত্রকে এক নাগাড়ে আমি তাই একটি বছর নষ্ট করতে বলব না। তার সমস্ত বিদ্যাভ্যাসকালের মধ্যে তাকে এই এক বছর দিতে বলব। তারা দেখবে যে এ ভাবে এক বছর দেওয়ায় সময় নষ্ট হয়নি। এ প্রচেষ্টায় তাদের মানসিক নৈতিক এবং শারীরিক উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করবে; পড়তে পড়তে তারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রেখে যেতে পারবে।



ঊনবিংশ অধ্যায়

আর্থিক বনাম নৈতিক প্রগতি

আর্থিক উন্নতির সঙ্গে কি আসল উন্নতির সংঘাত বাধে? আমি ধরে নিচ্ছি যে আর্থিক প্রগতির অর্থ হচ্ছে অপরিমিত আধিভৌতিক উন্নতি এবং আসল উন্নতির অর্থ হচ্ছে আমাদের শাশ্বত বৃত্তিগুলির ক্রমোন্নতি। বিষয়টিকে তাই এই ভাবে বলা যেতে পারে যে, নৈতিক প্রগতি কি আধিভৌতিক প্রগতির সাথে সমান তালে চলতে পারে না? আমি অবশ্য জানি যে আমাদের বর্ত্তমান সমস্যার তুলনায় এ বিষয়টি ব্যাপকতর। তবে সাহস করে আমি এ কথা বলতে পারি যে ক্ষুদ্রতর কিছুর ভিত্তিস্থাপনা কালে আমাদের দৃষ্টিপথে বৃহত্তর একটা কিছুই বিরজিত থাকে। কারণ বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে আমরা জানি যে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শাশ্বত শান্তি বা বিরাম বলে কিছুই নেই। তাই আধিভৌতিক প্রগতি এবং নৈতিক উন্নতির সাথে সংঘাত যদিও না বাধে তবুও নৈতিক উন্নতির তুলনায় আধিভৌতিক উন্নতিরই অধিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। বৃহত্তর বিষয়বস্তুর পক্ষসমর্থনে অক্ষম কেউ কেউ যেমন এলোমেলো ভাবে সময় সময় নিজেদের কথা পেশ করেন, তেমন ভাবে আমরা সন্তুষ্টি লাভ করতে পারি না। পরলোকগত স্যার উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার-বর্ণিত অর্দ্ধাশনে জীবনযাপনকারী ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখে তাঁরা বোধ হয় বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে এদের নৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা করা বা বলার আগে, এদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে হবে। তাঁরা বলেন

যে এই জন্য নৈতিক উন্নতির বদলে আধিভৌতিক প্রগতির উপর জোর দেওয়া হয়। আর তার পরই একটা মস্ত লাফ মারা হয় ও বলা হয় যে ত্রিশ কোটির বেলায় যে কথা খাটে সারা বিশ্বের বেলায়ও সে কথা খাটবে। তাঁরা ভুলে যান যে মামলা ঘোরালো হ'লে আইনও জটিল হয়। এই অনুমান যে কতখানি অবাস্তব তা বলা আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র। অসহনীয় দারিদ্র্যের চাপে নৈতিক অবনতি ছাড়া যে অন্য কিছু আর আসতে পারে না, এমন কথা কেউ কখনও বলেনি। প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচার অধিকার আছে, আর তাই নিজের অন্নবস্ত্র এবং বাস-স্থানের জোগাড় করারও তার অধিকার আছে। তবে এই সামান্য কাজটুকুর জন্য অর্থনীতিবিদ বা তাদের আইনকানুনের সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার যাবতীয় ধর্মগ্রন্থেই এই উপদেশ প্রতিধ্বনিত হয়েচে যে "আগামী কালের জন্য ভাবনা কোরো না।" জীবিকা অর্জ্জন করা, যে কোন সুসংগঠিত সমাজে দুনিয়ার সবচেয়ে সহজ কাজ মনে হয় বা হওয়াই বিধেয়। বস্তুত কোটিপতিদের সংখ্যা দ্বারা নয়, জনসাধারণের মধ্যে অনশনের অপ্রতুলতা দ্বারা একটি দেশের সুসংবদ্ধতা নিরূপিত হয়। এখন বিচার্য্য বিষয় হচ্চে এই যে, আধিভৌতিক প্রগতির অর্থ হচ্চে নৈতিক উন্নতি, এই কথাটি বিশ্বজনীন নীতি হিসাবে গ্রহণযোগ্য কি না।

কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। ঐহজাগতিক বিভবে রোম যখন অতীব সমৃদ্ধিশালী তখনই তার নৈতিক অধঃপতন ঘটল। মিশর এবং বোধ হয় যে সমস্ত দেশের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের বেশীর ভাগেরই অনুরূপ অবস্থা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং আত্মীয়রা যখন ধনকুবের তখনই তাঁদের পতন হয়! রকফেলার বা কার্ণেগী ইত্যাদির

নৈতিকতা যে সাধারণ পর্য্যায়ের ছিল এ কথা আমরা অস্বীকার করি না, তবে সানন্দে আমরা তাঁদের একটু আলগা ভাবেই বিচার করে থাকি। আমার এ কথার অর্থ হচ্চে এই যে তাঁদের কাছে পরিপূর্ণ নৈতিক নিরিখ আমরা আশা করতে পারি না। তাদের কাছে আধিভৌতিক উন্নতির অর্থ সব সময় নৈতিক উন্নতি নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেখানে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীর সাথে মেলামেশা করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, আমি লক্ষ্য করেচি যে যেখানে যত প্রাচুর্য্য সেখানে তত নৈতিক ভ্রষ্টাচার। বেশী কথা কি, আমাদের ধনিকবর্গ দরিদ্রদের মত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ রূপ নৈতিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেননি। ধনীদের আত্মসম্মানে গরীবদের মত অত আঘাত লাগেনি। বিপদের আশঙ্কা না থাকলে আমাদের আশেপাশের লোকদের মধ্যে থেকে আমি দেখাতে পারতাম যে কেমন ভাবে ধনসম্পদ থাকায় সত্যকার উন্নতির ব্যাঘাত হয়। সাহস করে আমি একথা বলতে পারি যে অর্থনীতির নিয়মকানুনের ব্যাপারে এ বিষয়ে অনেক আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে দুনিয়ার ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ অধিকতর নিরাপদ এবং প্রামাণ্য। আজ যে প্রশ্ন আমরা নিজেদের করচি তা মোটেই নতুন নয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একথা যিশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সেণ্ট মার্ক দৃশ্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা দিয়েচেন। গম্ভীর হয়ে যিশু উপবিষ্ট। চোখে তাঁর স্থির-সঙ্কল্পের ছবি। পরকাল সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করচেন। চারিধারের দুনিয়া সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সে সময়কার শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ তিনি। সময় ও ব্যবধানের মিতব্যয়িতায় তিনি সাফল্য অর্জ্জন করেছিলেন এবং তিনি উঠেছিলেন এ সবের উর্দ্ধে। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে একজন তাঁর কাছে দৌড়ে এসে নতজানু হয়ে বসে পড়ল এবং জিজ্ঞাসা করল, 'দয়ালু প্রভু, কি করলে আমি শাশ্বত সুখ পেতে পারি?' যিশু তাকে বলচেন,

'আমাকে দয়ালু বলচ কেন তুমি? সেই এক ঈশ্বর ছাড়া দয়ালু আর কেউ নেই। তাঁর আজ্ঞা তুমি জান। অধর্ম্মাচার কোরো না। জীবহত্যা কোরো না, চুরি কোরো না, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। কাউকে প্রতারিত কোরো না এবং নিজের মাতাপিতাকে সম্মান দিও।' এর জবাবে লোকটি তাঁকে বলল, 'প্রভু, আমার যৌবনকাল থেকেই আমি এসব মেনে চলচি।' তখন যিশু তার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'একটি জিনিষের অপ্রতুলতা তোমার মধ্যে আছে। তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রদের দান কর এবং তাহলে স্বর্গে গিয়ে তুমি সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। ফিরে এসে দুঃখ সহন কর আর আমাকে অনুসরণ কর।' এই কথায় বিষণ্ন হয়ে লোকটি চলে গেল, কারণ সে ছিল প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করে যিশু তাঁর শিষ্যদের লক্ষ্য করে বললেন: 'ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীরা কদাচিৎ প্রবেশ করতে পারে।' তাঁর শিষ্যবৃন্দ এ কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল, কিন্তু যিশু এর জবাব প্রসঙ্গে পুনরায় বললেন: 'বৎসগণ, আর্থিক সম্পদের শ্রেষ্ঠতায় যারা আস্থাবান তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। ধনীর ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে বরং ছুঁচের ফুটো দিয়ে গলে যাওয়া সহজ।' ইংরেজী সাহিত্যে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত জীবনের শাশ্বত নীতির বর্ণনার এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত। আজ আমরা যেমন অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়ি, তাঁর শিষ্যরাও সেইরকম করেছিল। আমাদেরই মত তাঁকে তারা বলেছিল: 'কিন্তু দেখুন, বাস্তব জীবনে এ নীতি কেমন অকার্য্যকরী। আমরা যদি সব বিক্রী করে দি, আর যদি কিছুই আমাদের না থাকে, তবে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার মতও কিছু আমাদের থাকবে না। অর্থ না থাকলে আমরা পরিমিত পরিমাণেও ধর্ম্মাচারী হতে পারি না।' সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম: "খুব আশ্চর্য্যান্বিত

হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল: 'তাহলে ত্রাণ পেতে পারে কে ?' তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে যিশু বললেন: 'মানুষের পক্ষে এ অসম্ভব ; কিন্তু ভগবানের কাছে নয়, কারণ তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।' তার পর পিটার তাকে বলতে লাগলেন: 'দেখুন আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করচি।' উত্তরে যিশু বললেন: 'প্রকৃতই আমি তোমাদের বলচি যে এমন কেউ নেই যে আমার জন্য বা ধর্ম্মের খাতিরে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, পিতা, মাতা, ভগ্নী বা জমিজমা এবং ঘর ইত্যাদি পরিত্যাগ করেচে। পরলোকে তারা শাশ্বত সুখ পাবে বা এখনকার চেয়ে শতগুণে গৃহ, আত্মীয়, ভগ্নী, পিতা, মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং জমিজমার সুখ ভোগ করতে পারবে এই আকাঙ্ক্ষায় তারা এসেচে। আজ যারা সবচেয়ে আগে আছে তারা হয়ত পিছনে পড়ে যাবে, আর যারা একেবারে পিছনে পড়ে আছে তারাই হয়ত থাকবে সর্ব্বাগ্রে'।" এ বিধান অনুসরণ করার ফল বা পুরস্কার (কথাটি যদি আপনার মনোমত বোধ হয়) হচ্চে এই। অন্যান্য অহিন্দু ধর্ম্মগ্রন্থ থেকে অনুরূপ অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজন আমি বোধ করি না। যিশুবর্ণিত নীতির সমর্থনে আমাদের নিজেদের মুনি-ঋষিদের লেখা বাণী উদ্ধৃত করে, বা এমন কি বাইবেলের যে অংশটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেচি, তার চেয়েও কড়া তাঁদের কোন বাণী বা লেখা উদ্ধৃত করে, আমি আপনাদের অপমানিত করতে চাই না। আমাদের সামনে যে প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে জগতের মহান উপদেশকবৃন্দের জীবনই বোধ হয় এই নীতি সমর্থনকারী সবচেয়ে প্রামাণ্য সাক্ষ্য। যিশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবির, চৈতন্য, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদির সহস্র সহস্র লোকের উপর অতুলনীয় প্রভাব ছিল এবং তাঁরা তাদের চরিত্র গঠন করেছিলেন। তাঁরা এ দুনিয়ায় এসেছিলেন বলে জগৎ ধন্য। আর স্বেচ্ছায় তাঁরা সবাই দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক উন্মত্ততাকে যতই আমরা আমাদের আদর্শ বলে মনে করচি, অবনতির পথে ততটাই আমরা নেমে যাচ্চি, এই যদি আমার স্থির বিশ্বাস না হ'ত তবে যে বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য আমি এত চেষ্টা করচি, তা করতাম না। আমার ধারণা এই যে, যে ধরণের অর্থ নৈতিক উন্নতির কথা আমি বলেচি, সত্যকার উন্নতির পথে তা পরিপন্থী স্বরূপ। তাই পুরা-কালের আদর্শ ছিল সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সংযত করা। এর ফলে যাবতীয় আধিভৌতিক কামনা-বাসনার পরিসমাপ্তি হয়ে যায় না। বরাবরের মত আমাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবেন, ধনার্জ্জনের প্রচেষ্টাকেই যাঁরা জীবনের লক্ষ্য করে তুলবেন। কিন্তু চিরকালই আমরা দেখে আসচি যে এতে আদর্শ-চ্যুতি হয়। একটি মজার ব্যাপার এই যে আমাদের মধ্যে প্রভূত বিত্তশালীরাও সময় সময় মনে করেন যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নিলে তাঁরা ভাল করতেন। কেউ যে একই সাথে ঈশ্বর এবং কুবেরের সেবা করতে পারে না, এ এক মূল্যবান অর্থ নৈতিক তথ্য। আমাদের পথ বেছে নিতে হবে। বস্তু-তান্ত্রিকতার দানবের পদতলে পড়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ আর্ত্তনাদ করচে। তাদের নৈতিক উন্নতি বন্ধ হয়ে গেছে। টাকা, আনা, পয়সা দিয়ে তারা তাদের উন্নতির পরিমাপ করে। আমেরিকার সম্পদ তাদের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েচে। আমেরিকা অন্যান্য দেশের হিংসার পাত্র হয়ে উঠচে। আমার বহু স্বদেশবাসীকে আমি বলতে শুনেচি যে আমরা আমেরিকার মত সম্পদ অর্জ্জন করব বটে, তবে তাদের সম্পদ অর্জ্জনের পন্থাকে বর্জ্জন করব। আমার মতে এ রকম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে বাধ্য। একসাথে আমরা "জ্ঞানী, শান্ত এবং ক্রোধোন্মত্ত" হতে পারি না। নৈতিক বলে দুনিয়ায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হতে নেতৃবৃন্দ আমাদের শিক্ষা দিন, এই আমি চাই। কথিত আছে যে এক সময় আমাদের দেশ ঈশ্বরের বাসস্থান ছিল। যে দেশ কলকারখানার বিকট

আওয়াজে এবং চিমনির ধোঁয়ায় ভরে গেছে এবং যে দেশের রাস্তাগুলিতে চলাচলে বাধা সৃষ্টিকারী এমন সব দ্রুতগতি যান্ত্রিক শকট চলে, যার অন্যমনস্ক যাত্রীসমূহ জানেনা যে তারা কি চায়, এবং পাথরের মত বাক্স-বন্দি করলে বা একেবারে অপরিচিত আগন্তুকদের মধ্যে পড়লেও যাদের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় না এবং যে দেশের যাত্রী এবং আগন্তুকবর্গ সম্ভব হলে পরস্পর পরস্পরকে স্থানচ্যুত করতে উদ্‌গ্রীব, সে দেশে ঈশ্বরের কথা ধারণাও করা যায়না। আধিভৌতিক প্রগতির প্রতীক বলেই এসবের আমি উল্লেখ করলাম। কিন্তু এতে এক কণাও সুখ আসে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়ালেশ নিম্নলিখিত ভাষায় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেচেন।

"অতীতের যে সমস্ত প্রাচীনতম তথ্যরাজি আমরা পেয়েচি, তাতে এই কথার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় যে নৈতিকতা সম্বন্ধে তৎকালীন সাধারণ ধারণা ও চিন্তাধারা, নৈতিকতার মান এবং এর ফলে উদ্ভূত আচার ব্যবহার, এখনকার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।"

আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে ইংরেজ জাতি যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েচে, এর পরে কয়েকটি অধ্যায়ে তিনি তা বিশ্লেষণ করেচেন। তিনি বলচেন: "সম্পদের এইরূপ অভাবনীয় সমৃদ্ধি হওয়ায় ও প্রকৃতিকে জয় করার ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার ফলে, আমাদের নতুন সভ্যতা ও অগভীর খৃষ্টীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর মারাত্মক চাপ পড়েচে। এর ফলে বহুবিধ সামাজিক ব্যভিচার অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়কর গতিতে আমাদের মধ্যে এসে পড়েচে।" কেমন ভাবে নরনারী এবং শিশুর মৃতদেহের উপর কলকারখানা সমূহ গড়ে উঠেচে এবং কেমন ভাবে দেশের অর্থসম্পদের সমৃদ্ধি হওয়ার সাথে সাথে নৈতিক অবনতি ঘটেচে, এই তিনি এর-পর দেখিয়েচেন। অপরিচ্ছন্নতা, আয়ুক্ষয়কারী বৃত্তি, ভেজাল দেওয়া, ঘুষ নেওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি এ কথা প্রমাণ

করেছেন। আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে ন্যায় কি ভাবে পদদলিত হচ্ছে, পানাসক্তি এবং আত্মহত্যার ফলে মৃত্যুহার কেমনভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, কেমন ভাবে অপরিণত অবস্থায় জন্মহারের গড় ও জন্মদোষসম্পন্ন শিশুর সংখ্যা বাড়চে এবং বেশ্যাবৃত্তি একটি বিধিসম্মত প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এ সবই তিনি দেখিয়েছেন। নিম্নলিখিত অর্থব্যঞ্জক মন্তব্য সহকারে তিনি তাঁর বিশ্লেষণের পরিসমাপ্তি করেছেন :

"সম্পদ এবং অবকাশের পরিণামের অপর দিকটি যে কি তা জানা যায় বিবাহবিচ্ছেদের আদালতের কার্য্যবিবরণী থেকে। এ ছাড়া আমার একটি বন্ধু, লণ্ডনের বিলাসী সমাজে যাঁর যথেষ্ট যাতায়াত আছে, আমাকে বলেছিলেন যে, লণ্ডন এবং মফস্বলে সময় সময় এমন সব বহু প্রকারের নৈশকালীন প্রমোদের ব্যবস্থা দেখা যায় যে চরমতম ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্রাটদের রাজত্বকালীন ব্যবস্থাসমূহকেও সেগুলি ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধ সম্বন্ধেও আমার বলার কিছুই নেই। রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের পর থেকে কমবেশী এ অবশ্য চলেই আসচে, তবে বর্ত্তমানে যাবতীয় সভ্যজাতিসমূহের নিঃসন্দেহেই যুদ্ধবিমুখতা দেখা দিয়েচে। কিন্তু যখন অস্ত্রশস্ত্রের বিরাট বোঝা এবং শান্তির স্বপক্ষের সদিচ্ছাপ্রণোদিত ঘোষণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন এই কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আদর্শ হিসাবে শাসক-সম্প্রদায়ের ভিতর নৈতিকতার লেশমাত্র নেই।"

ইংরেজদের আওতায় আমরা অনেক কিছু শিখেচি, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যথার্থ নৈতিকতার ব্যাপারে ব্রিটেনের কাছ থেকে আমাদের শেখার মত বিশেষ কিছু নেই। বস্তুতান্ত্রিকতার ব্যারামের ফলে ব্রিটেন যে সমস্ত পাপাচারের আকর হয়ে উঠেচে, সতর্ক না হলে আমরা সে সমস্তই আমাদের দেশে আমদানী করব। আমাদের সভ্যতা এবং নৈতিকতাকে আমরা যদি বজায়

রাখি, অর্থাৎ গৌরবোজ্জল অতীত নিয়ে গর্ব্ব না করে, আমাদের নিজেদের জীবনে সেই প্রাচীন নৈতিক গৌরবকে ফুটিয়ে তুলি, তবেই আমরা ইংলণ্ড এবং ভারত উভয়েরই উপকার করব। শাসনকর্ত্তা যোগাড় করে দেয় বলে যদি আমরা তার অনুকরণ করি, তবে তারা এবং আমরা উভয়েই অপমান ভোগ করব। আদর্শের সম্বন্ধে বা সে আদর্শকে চূড়ান্তরূপে বাস্তবে পরিণত করা সম্বন্ধে আমাদের শঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। খাঁটি আধ্যাত্মিক জাতি আমরা তখনই হব, যখন সোনার চেয়ে সত্য অধিক পরিমাণে আমাদের দেশে দৃষ্ট হবে, ক্ষমতা এবং সম্পদের জাঁকজমকের চেয়ে নির্ভীকতা বেশী হবে, এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে বদান্যতার স্থান উর্দ্ধে হবে। আমাদের গৃহ, প্রাসাদ এবং মন্দিরগুলিকে আমরা বিভবের আওতা থেকে মুক্ত করে সেগুলিতে নৈতিকতার নৈসর্গিক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করতে পারলে ব্যয়বহুল এক সেনাদলের ভার না বহন করেও আমরা যে কোন বিরুদ্ধ শক্তির সাথে সংগ্রাম করতে পারব। আমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর পবিত্রতার অন্বেষণ করা সুরু করলে দেখব যে সব কিছুই নিঃসন্দেহে তার পর পেয়ে যাব। এই হচ্ছে খাঁটি অর্থনীতি। আমরা সবাই যেন এ সঞ্চয় করতে পারি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ'কে প্রয়োগ করতে পারি।

বিংশ অধ্যায়

ভারত এবং সমাজতন্ত্রবাদ

পুঁজিপতিদের দ্বারা পুঁজির অপব্যবহারের তথ্য আবিষ্কৃত হবার পর সমাজতন্ত্রবাদের সৃষ্টি হয়নি। ঈশোপনিষদের প্রথম ছত্রে সমাজতন্ত্রবাদ ও এমন কি সাম্যবাদের ভাবধারা সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কোন কোন সংস্কারক যখন মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনের উপর আস্থা হারিয়ে ফেললেন, তখনই সৃষ্ট হ'ল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ। বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিকদের সামনে যে সমস্যা তারই আমি সমাধানের চেষ্টা করচি। অবশ্য এ কথা সত্য যে সর্ব্বদাই শুধু খাঁটি অহিংস উপায়ে আমি এই চেষ্টা করে থাকি। আমার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে পারে। যদি এর বিনাশ ঘটে তবে অহিংস প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতার দরুণই এ হবে। যে ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি উত্তরোত্তর আমার আস্থা বেড়ে যাচ্চে, আমি হয়ত তার অযোগ্য ব্যাখ্যাকারক হতে পারি। নিখিল ভারত চরখা সঙ্ঘ এবং নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সঙ্ঘ নামক প্রতিষ্ঠান দুটি মারফৎ সারা ভারতে অহিংসার প্রক্রিয়ার পরীক্ষা চলচে কংগ্রেসের মত সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালী সদাপরিবর্ত্তনশীল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, কোন বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে আমার গবেষণা আমি যাতে চালিয়ে যেতে পারি সেই জন্য কংগ্রেস কর্ত্তৃক এই বিশেষ সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠান দুটির সৃষ্টি হয়েচে।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আমাদের খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদের শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁরা শিখিয়েচেন: "সমস্ত জমিই যখন গোপালের তখন এর সীমারেখা আর কোথায়? মানুষই হচ্ছে এই সীমারেখার সৃষ্টিকর্ত্তা,

তাই এ'কে সে ভেঙে দিতেও পারে।" গোপালের ভাষাগত অর্থ রাখাল হলেও, গোপাল বলতে ঈশ্বরকেও বোঝায়। আধুনিক ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্র অর্থাৎ জনসাধারণ। এ কথা সত্য যে জনসাধারণ আজ জমির মালিক নয়। তবে সে দোষ ঐ শিক্ষার নয়। এ দোষ আমাদের, যারা এ শিক্ষা অনুযায়ী চলিনি। এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে রাশিয়া এবং অন্যান্য জাতিসমূহের মত সুষ্ঠুভাবে, তাও আবার হিংসা প্রয়োগ না করেই, আমরা এ আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করতে সফলকাম হতে পারি। সহিংস উপায়ে কাউকে কোন অধিকারচ্যুত করার সর্ব্বাধিক কার্য্যকরী বিকল্পব্যবস্থা হচ্ছে চরখা এবং তার আনুষঙ্গিক যাবতীয় কার্য্যক্রম। জমি বা যাবতীয় সম্পত্তি হচ্ছে তারই, যে এ সবের জন্য পরিশ্রম করে। দুর্ভাগ্যবশত শ্রমিকশ্রেণী এই সাধারণ তথ্যটি জানে না বা তাদের জানতে দেওয়া হয় না।

এই দাবী আমি জানিয়েচি যে ভারতে আমার পরিচিত যারা নিজেদের সমাজতান্ত্রিক নীতির অনুসরণকারী বলে পরিচয় দেন, তাঁদের অনেক আগে থেকেই আমি সমাজতান্ত্রিক। তবে আমার সমাজতন্ত্রবাদ আমার কাছে স্বভাবজ এবং কোন বই থেকে আমাকে এ নীতি গ্রহণ করতে হয়নি। অহিংসায় আমার অবিচল বিশ্বাস থেকেই এর সৃষ্টি হয়েচে। যেখানেই অনুষ্ঠিত হ'ক না কেন, সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াতে পারলে সক্রিয় ভাবে কেউ অহিংস হতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশত আমি যতদূর জানি, পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্রবাদীরা সমাজতান্ত্রিক নীতিকে কার্য্যকরী করার জন্য হিংসার প্রয়োজনীয়তার উপর আস্থাশীল।

বরাবরই আমার অভিমত হচ্ছে এই যে, শক্তি প্রয়োগ দ্বারা একেবারে দীন-দরিদ্রের জন্যও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জ্জন করা যায় না। এ ছাড়া আমার

বিশ্বাস যে, দীনদরিদ্রদের যে অবিচার ভোগ করতে হয়, অহিংস উপায়ে তার প্রতীকার করার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিলে এই সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জ্জন করা সম্ভব। এর মানে হচ্চে অহিংস অসহযোগ। সময় সময় অসহযোগ সহযোগেরই মত অবশ্যকরণীয় কর্ত্তব্য হয়ে ওঠে। নিজের ধ্বংস সাধন করে বা দাসত্ব মেনে নিয়ে কেউ সহযোগিতা করতে বাধ্য নয়। যতবড় শুভার্থী হ'ক না কেন, অপরের প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জ্জন করলে, সে প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটা মাত্র আর স্বাধীনতা বজায় রাখা যায় না। অর্থাৎ এ'কে সত্যকার স্বাধীনতা বলা যায় না। কিন্তু অহিংস অসহযোগ দ্বারা এ'কে অর্জ্জন করতে শেখা মাত্র একেবারে যে দীন সেও স্বাধীনতার উজ্জ্বল ছটার অস্তিত্ব অনুভব করতে পারে। এ বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ যে হিংসায় যা কখনও সম্ভব নয়, অহিংস অসহযোগ তাকে সম্ভব করে তুলতে পারে, আর তাও শেষ পর্য্যন্ত অন্যায়কারীর হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করে। অহিংসাকে যতখানি সুযোগ দেওয়া উচিত ভারতবর্ষে তা আমরা দিইনি। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্চে এই যে অবিশুদ্ধ অহিংসা দ্বারাই আমরা এতটা সফলকাম হয়েচি।

সম্মানজনক ভাবে ভরণপোষণ চালানোর জন্য শুধু যেটুকু দরকার, তার চেয়ে বেশী জমি কারও থাকা উচিত নয়। এ কথা কে অস্বীকার করতে পারে যে, নিজের ব'লে কিছু জমি না থাকার জন্যই জনসাধারণের এই অসীম দারিদ্র্য? তবে এ কথা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে অহিংস উপায়ে এই সংস্কার প্রবর্ত্তন করতে হলে তাড়াহুড়ো করলে চলবে না। বিত্তবান এবং নিঃস্ব উভয়কেই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে এই সংস্কার প্রবর্ত্তিত করা সম্ভব।

সমাজতন্ত্রবাদী কে?

সমাজতন্ত্রবাদ কথাটি মধুর এবং সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আমি যতটুকু জানি তাতে সমাজের সকল সদস্যই হবে সমান—কেউ নীচ বা কেউ উচ্চ নয়।

শরীরের মধ্যে সবার উপরে অবস্থিত বলে মস্তক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নয় বা মাটিতে লেগে থাকে বলে পায়ের তলা একেবারে হীন নয়। শরীরের বিভিন্ন অংশের মত সমাজের বিভিন্ন অংশও সমান এই হচ্চে সমাজতন্ত্রবাদ।

রাজা এবং চাষী, ধনী বা নির্ধন, মালিক ও শ্রমিক ইত্যাদি সবারই মর্য্যাদা এই সমাজব্যবস্থার আওতায় সমান। ধর্ম্মের দিক থেকে সমাজতন্ত্রবাদে কোন রকম দ্বিত্ব ভাব নেই। সব যায়গাই দ্বিধা বা বহুধা বিভক্ত। ঐক্যের অভাব স্পষ্ট। এ উচ্চবর্ণের ও হীন, এ হিন্দু ও মুসলমান, তৃতীয়জন খৃষ্টান, চতুর্থজন পার্শি, পঞ্চমজন শিখ বা ষষ্ঠ ব্যক্তি ইহুদী। এ সবের ভিতর আবার উপবিভাগ রয়েচে। আমার আকাঙ্ক্ষিত ঐক্যে এসবের মধ্যে সম্পূর্ণ সৌহার্দ্দ্য বিরাজমান।

এই অবস্থায় পৌঁছাবার জন্য বিষয়টিকে শুধু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিশ্লেষণ করে এ কথা বললে চলবে না যে সবাই সমাজতন্ত্রবাদে দীক্ষিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের কোন কিছু করা ঠিক হবে না। নিজেদের জীবনযাত্রায় পরিবর্ত্তন সাধন না করেই আমরা বক্তৃতা দিয়ে যেতে পারি, দল গড়তে পারি, আর সামনে পেয়ে গেলে বাজপাখির মত ছোঁ মেরে শিকার ধরতেও পারি। এ'কে সমাজতন্ত্রবাদ বলে না। যতই আমরা এ'কে শিকার বলে বিবেচনা করব ও এ'কে জোর করে ভোগ করতে যাব, ততই আমাদের কাছ থেকে এ আদর্শ দূরে সরে যাবে।

সমাজতন্ত্রবাদের সূচনা হয় দীক্ষিত প্রথম ব্যক্তিটির সাথে সাথে। এরকম এক জনও যদি থাকে, তবে এই একটির সাথে শূন্য যোগ করা যায়, এবং সে অবস্থায় প্রথম শূন্যটির অর্থ হয় দশক এবং এই ভাবে প্রত্যেকটি শূন্যের অর্থ হয়ে দাঁড়ায় পূর্ব্বের সংখ্যার দশগুণ। সূচনাকারীই যদি শূন্য হয়, অর্থাৎ কেউ আসলে যদি শুরুই না করে, তবে তার সাথে শূন্য যোগ করলে তার

ফল শূন্যই হবে। এই সব শূন্যের হিসাব রাখতে যে সময় ও কাগজ যাবে সে সবই হবে নষ্ট।

সমাজতন্ত্রবাদ হচ্চে স্ফটিকের ন্যায় শুদ্ধ। সুতরাং এ'কে অর্জন করার জন্য স্ফটিকবৎ পন্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। অসৎ পন্থার ফল হচ্চে অসৎ পরিণাম। সুতরাং রাজার শিরশ্ছেদ করলেই রাজা এবং চাষী সমপর্য্যায়ভুক্ত হবে না বা কাটাকুটি করলেই মালিক ও শ্রমিক সমান হবে না। অসত্য দ্বারা কেউ সত্যে উপনীত হতে পারে না। সত্য আচরণেই শুধু সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব। সত্য এবং অহিংসা কি পৃথক সত্তা বিশিষ্ট নয়? এর জবাব হচ্চে একটি জোরালো 'না'। সত্যের ভিতর অহিংসা নিহিত রয়েচে এবং অহিংসার ভিতরে আছে সত্য। এই জন্যই এদের একটি মুদ্রারই এপিঠ ওপিঠ বলা হয়। এর কোন একটিকে অপরটির কাছ ছাড়ানো যায় না। মুদ্রার উপরের লেখাগুলি যে-কোন দিক থেকে পড়া যাক না কেন, এর অক্ষরবিন্যাসে পার্থক্য হলেও, মুদ্রার দামের তারতম্য হয় না। সম্পূর্ণ পবিত্রতা বিনা এমন সুন্দর অবস্থায় পৌছান যায় না। মনে বা শরীরে অপবিত্রতা থাকলে নিজের ভিতর অসত্য এবং হিংসার উদ্রেক হবেই।

তাই শুধু সত্যাশ্রয়ী, অহিংস এবং পবিত্রচিত্ত সমাজতান্ত্রিকরাই ভারতবর্ষ এবং সারা দুনিয়াতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ রচনা করতে সক্ষম হবে। সম্পূর্ণ রূপে সমাজতান্ত্রিক কোন রাষ্ট্র দুনিয়ায় আছে বলে আমার জানা নেই। উপরে বর্ণিত পন্থা বিনা সে রকম সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব।

সাম্যবাদ

রুশীয় ধরণের সাম্যবাদে, অর্থাৎ যে সাম্যবাদকে জোর করে জনসাধারণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, ভারতবর্ষ বিদ্রোহী হবে। বিনা হিংসায় সাম্যবাদ স্থাপিত হলে সে হবে আনন্দের বিষয়। কারণ জনসাধারণের জন্য জনসাধা-

রণের প্রতিভূ হিসাবে ছাড়া তখন আর কারও কোন সম্পত্তি থাকবে না। লক্ষপতির হয়ত লক্ষ লক্ষ টাকা থাকতে পারে, কিন্তু সে সব তিনি নিজের কাছে রাখবেন জনসাধারণের জন্য। সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য রাষ্ট্র যখনই চাইবে তার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করতে পারবে।

চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সাম্যবাদের কি অর্থ দাঁড়ায়? এর অর্থ হচ্চে এমন এক শ্রেণীবিহীন সমাজ, যে আদর্শ পূর্ত্তির জন্য কাজ করে যাওয়া গৌরবের বিষয়। এ আদর্শ অর্জ্জনের জন্য শুধু যখন শক্তির সাহায্য নেওয়া হয়, তখনি আমি ভিন্ন পথ ধরি। সবাই আমরা সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও এতদিন ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের বিরোধাচরণ করেচি। অসাম্যের ভাব, 'উচ্চ-নীচে'র ধারণা হচ্চে অন্যায়; তবে বলপ্রয়োগ করে মানুষের মন থেকে অন্যায় দূর করা যায় বলে আমি বিশ্বাস করি না। মানুষের মন এই উপায়ের কাছে নতি-স্বীকার করে না।

একবিংশ অধ্যায়

অধিকার না কর্ত্তব্য

এমন একটি বিষয়ে আমি আলোচনা করতে চাই, সমাজের পক্ষে আজ যা পীড়ার কারণ হয়ে উঠচে। পুঁজিপতি এবং জমিদারেরা তাঁদের অধিকারের কথা বলেন, শ্রমিক আবার অন্যদিকে নিজেদের অধিকারের কথা তোলে, রাজন্যবর্গ বলেন তাঁদের রাজত্ব করার স্বর্গীয় অধিকারের কথা আর প্রজারা বলে তা প্রতিরোধের কথা। সবাই যদি শুধু অধিকারের প্রতিই জোর দেয়, এবং কর্ত্তব্যের খেয়াল না করে, তবে সবকিছু গোলমাল এবং বিশৃঙ্খল হয়ে যাবে।

অধিকারের প্রতি জোর না দিয়ে সবাই যদি নিজের কর্ত্তব্য করে যায় তবে অনতিবিলম্বে মানবসমাজে শান্তির রাজত্ব স্থাপিত হবে। এমন কোন স্বর্গীয় অধিকার রাজন্যবর্গের নেই যে তাঁরা শুধু শাসন করবেন আর রায়তরা সসম্মানে তাদের প্রভুর আদেশ মেনে চলবে। এ কথা যেমন সত্য যে সমাজের মঙ্গলের পরিপন্থী হবার জন্য এই সব উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জ্জিত অসাম্যের অবসান ঘটা দরকার, তেমনি সেই সমাজের মঙ্গলেরই জন্য, কাল পর্য্যন্ত যারা দলিত ছিল, আজ হঠাৎ তাদের এই অসঙ্কোচে স্বাধিকার প্রবর্ত্তনের প্রচেষ্টাও সমান, ও এমনকি বোধহয় অধিকতর হানিকারক। সামান্য কয়েকজন স্বর্গীয় অধিকারের দাবীদারের তুলনায় এই মনোবৃত্তির ফলে বোধ হয় লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশী। তারা বড়জোর সাহসী বা ভীরুর মত মরতে পারে, কিন্তু এই কয়েকজনের মৃত্যুর ফলে সুখী, পরিতৃপ্ত এবং পরিপাটী জীবনযাত্রার ভিত্তি স্থাপিত হবে না।

তাই অধিকার এবং কর্ত্তব্যের পারস্পরিক সম্বন্ধটি বোঝা দরকার। আমার অভিমত হচ্চে এই যে, সুসম্পাদিত কর্ত্তব্য মারফৎ সরাসরি যে অধিকার অর্জ্জিত হয় না, তার কোন মর্য্যাদা নেই। এ হবে বিনা অধিকারে কোন কিছু দখল করার মত এবং যত তাড়াতাড়ি এ'কে ত্যাগ করা যায় ততই মঙ্গল। যে হতভাগ্য পিতামাতা প্রথমে সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য পালন না করে তার আনুগত্যের জন্য দাবী জানায়, তারা শুধু করুণার পাত্র। লম্পট স্বামী যদি তার কর্ত্তব্যপরায়ণ স্ত্রীর কাছ থেকে সর্ব্বতোভাবে বশ্যতার আশা করে তবে তাকে ধর্ম্মীয় বিধানের বিকৃতি করা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। কিন্তু সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে উন্মুখ জনক-জননীকে যে সন্তান অবজ্ঞা করে, তাকে অকৃতজ্ঞ বিবেচনা করা হবে এবং এতে তার জনক-জননীর চেয়ে নিজেরই ক্ষতি হবে বেশী। এ একই কথা স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। মালিক ও শ্রমিক, জমিদার এবং চাষী, রাজন্যবর্গ এবং তাঁদের প্রজাপুঞ্জ বা হিন্দু এবং মুসলমান, যার প্রতিই এই সহজ অথচ বিশ্বজনীন নীতি প্রয়োগ করা যাক না কেন, এর ফলে দেখা যাবে যে, সারা দুনিয়া এবং ভারতের জীবনযাত্রা এবং কাজকর্ম্মের ক্ষেত্রে এখন যে সমস্ত গণ্ডগোল রয়েচে, সে সব সৃষ্টি না করেই জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে আনন্দদায়ক সম্পর্ক স্থাপিত করা যেতে পারে। নিজ কর্ত্তব্য এবং তার ফলে উদ্ভূত অধিকারের যথোচিত মর্য্যাদা দিয়ে তবে আমার বর্ণিত সত্যাগ্রহের অনুশাসনে উপনীত হতে হবে।

মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি হিন্দুর কর্ত্তব্য কি? তার কর্ত্তব্য হচ্চে মানুষের মত তার সাথে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হওয়া এবং তার সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করে তার বিপদের সময় সহায়তা করা। তবেই তার মুসলমান প্রতিবেশীর কাছ থেকে অনুরূপ ব্যবহার পাবার অধিকার জন্মাবে এবং সম্ভবত প্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া যাবে। কোন গ্রামে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ

হলে এবং তাদের মধ্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য কয়েকজন মুসলমান থাকলে, সেখানে সেই সামান্য কয়েকজন মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠদের দায়িত্ব বহুগুণ বেড়ে যায়। এমন কি সেই সামান্য কয়েকজন যেন এমন কথা মনে করার সুযোগ না পায় যে ধর্মমতের প্রভেদের জন্যে হিন্দুরা তাদের সাথে পার্থক্যমূলক আচরণ করচে। শুধুমাত্র সেই অবস্থাতেই, তার পূর্ব্বে নয়, মুসলমানদের স্বাভাবিক মিত্র হবার অধিকার হিন্দুরা অর্জ্জন করবে এবং বিপৎকালে উভয় সম্প্রদায় সম্মিলিত হয়ে কাজ করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্বেও, সামান্য কয়েকজন মুসলমান যদি উপযুক্তভাবে সাড়া না দেয় এবং সমস্ত কাজেরই যদি বিরোধিতা করে, তবে সে হবে মনুষ্যত্বহীনতার নিদর্শন। সে অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কর্ত্তব্য কি? সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগে বলপ্রয়োগ করে তাদের পরাভূত করা নিশ্চয়ই নয়। সে হবে জোর করে অপরের অর্জ্জিত সত্ব দখল করা। নিজের ভাইএর মনুষ্যত্ববিরোধী কাজ যেমনভাবে বন্ধ করা হয়, তাদের কর্ত্তব্যও তখন হবে তেমনি। এই উদাহরণ নিয়ে আরও বিশদ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এই বলে আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই যে, উভয় সম্প্রদায়ের সংখ্যা কোথাও ঠিক এর বিপরীত হলেও, এই একই নীতি প্রযুক্ত হবে। যা কিছু আমি বলেচি তাতে সহজেই লাভজনক ভাবে এই নীতি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে। প্রথমে কোন কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পাদন করার পর অর্জ্জিত হয় প্রত্যেক অধিকার। এই নীতি জনসাধারণ বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে না বলে সমগ্র পরিস্থিতি বর্ত্তমানে হতাশাজনক।

এই একই নীতি রাজন্যবর্গ এবং রায়তদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। প্রথমোক্তের কর্ত্তব্য হচ্চে জনসাধারণের খাঁটি সেবকের ন্যায় আচরণ করা। তলোয়ারের জোরে তো নয়ই, বাইরের কোন কারও দ্বারা অর্পিত অধিকারের জোরেও তাঁরা

শাসন করবেন না। বিজ্ঞতা এবং সেবার বলে তাঁরা দেশ শাসন করবেন। তাহলে তাঁদের স্বেচ্ছায় দেওয়া কর আদায় করার অধিকার হবে এবং অনুরূপ ভাবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবা পাবার তাঁরা আশা করতে পারবেন। তবে তাঁদের নিজেদের জন্য নয়, এ সমস্ত হবে তাঁদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন জনসাধারণের জন্য। এই সহজ এবং প্রাথমিক কর্ত্তব্য যদি তাঁরা পালন না করেন, তবে রায়তদের সে অবস্থায় তাঁদের প্রতি কোন রকম পাল্টা কর্ত্তব্য তো নেইই, বরং রাজকীয় জবরদস্তির প্রতিরোধ করাই তাদের কর্ত্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। ঘুরিয়ে বললে এর মানে হচ্চে এই যে, সে অবস্থায় রায়তরা জবরদস্তি বা কু-শাসন প্রতিরোধ করার অধিকার অর্জ্জন করে। তবে প্রতিরোধ যদি হত্যা, বল-প্রয়োগ, এবং লুঠপাটের রূপ পরিগ্রহ করে তবে কর্ত্তব্যের দৃষ্টিকোণ থেকে সে হবে মনুষ্যত্বের বিরুদ্ধে অপরাধ স্বরূপ। কর্ত্তব্যসম্পাদন করা দ্বারা স্বাভাবিক রূপে যে শক্তির উদ্ভব হয়, সে হচ্চে সত্যাগ্রহের অহিংস এবং দুর্জ্জয় শক্তি।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ভূমিকর্ষণকারী

শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতীয় সমাজের সত্যকার উন্নতি করতে হলে, বিত্তশালী সম্প্রদায়কে নিশ্চিত রূপেই এ কথা মেনে নিতে হবে যে রায়তদের হৃদয় তাঁদের নিজেদেরই মত এবং আর্থিক সম্পদে সম্পদশালী হবার কারণ তাঁরা গরীবদের চেয়ে কোনমতেই উচ্চস্তরের নয়। নিজেদের তাঁরা বিবেচনা করবেন জাপানী অভিজাত সম্প্রদায়ের মত, অধীনস্থ নাবালক রায়তদের মঙ্গলের জন্য যাঁরা অছি হয়ে সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। এ অবস্থায় তাঁরা নিজেদের পারিশ্রমিক বাবদ সম্পত্তির একটা ন্যায়সঙ্গত অংশ ছাড়া আর কিছু গ্রহণ করবেন না। রায়তদের নোংরা পারিপার্শ্বিকতা ও চরম দারিদ্র্য, যার মধ্যে বিত্তবানরা বসবাস করে, এবং সম্পদশালীদের অনাবশ্যক আড়ম্বর এবং অমিত-ব্যয়িতা—এই দুইএর মধ্যে বর্তমানে কোন সামঞ্জস্য নেই। একজন আদর্শ জমিদার তাই বর্তমানে রায়তদের যে বোঝা বইতে হচ্চে তার বেশ কিছুর ভার লাঘব করবেন। তিনি রায়তদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবেন এবং তাদের অভাবের কথা জেনে, যে হতাশা তাদের জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করচে, তার বদলে তাদের ভিতর আশার সঞ্চার করবেন। রায়তরা পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যের বিধিসমূহ জানে না বলে তিনি নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন না। রায়তরা যাতে জীবনধারণোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী পায়, তার জন্য নিজেকে তিনি দারিদ্র্যের চরম সীমায় টেনে নিয়ে যাবেন। রায়তদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে নিজে তিনি জানবেন এবং বিদ্যালয় স্থাপনা করে তিনি একসাথে সেখানে নিজের ও রায়তদের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। গ্রামের কূপ এবং

পুষ্করিণীর তিনি সংস্কার সাধন করবেন। নিজের প্রচেষ্টায় নিজেদের রাস্তা এবং পায়খানা পরিষ্কার করার শিক্ষা তিনি রায়তদের দেবেন। নিজের বাগানগুলি তিনি নির্ব্বিচারে রায়তদের ব্যবহার করার জন্য খুলে দেবেন। নিজের আমোদপ্রমোদের জন্য যে সব অতিরিক্ত ঘর তিনি রাখতেন, সেগুলি তিনি চিকিৎসালয় বা বিদ্যানিকেতন ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করবেন। পুঁজিপতিরা যদি কালের নির্দ্দেশকে বুঝতে পারেন, এবং তাঁদের তথাকথিত ঈশ্বরদত্ত অধিকারাবলীর সম্বন্ধে যদি তাঁদের মত পরিবর্ত্তন করেন, তবে যে সাতলক্ষ গোময়স্তূপকে 'গ্রাম' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলিকে শান্তি, স্বাস্থ্য এবং স্বাচ্ছন্দ্যের আকরে পরিণত করা যেতে পারে। আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, পুঁজিপতিরা জাপানের সামুরাইদের পথ অনুসরণ করলে তাঁদের লোকসান তো কিছুই নেই বরং ষোল আনাই লাভ। পুঁজিপতিদের সামনে দুটি মাত্র পথ খোলা আছে। একদিকে স্বেচ্ছায় নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ ত্যাগ করে সত্যকার সুখের আস্বাদন পাওয়া ও অন্যদিকে আসন্ন বিশৃঙ্খলতা। পুঁজিপতিরা সময়মত না জাগার জন্য জাগ্রত অথচ অজ্ঞ ও বুভুক্ষু জনসাধারণ দেশকে এ পথে টেনে নিয়ে যাবে এবং প্রভূতশক্তিশালী যে-কোন শাসনব্যবস্থা তার সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে নিয়োগ করেও এ'কে ঠেকাতে পারবে না। আমি আশা করি যে, ভারত যেন এ সঙ্কট এড়াতে পারে।

কিষাণের অধিকার

এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, আমাদের দেশে যদি গণ-তান্ত্রিক স্বরাজ স্থাপিত হয় (অহিংস উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হলে এরকম হওয়া খুব স্বাভাবিক) রাজনৈতিক ক্ষমতা সহ সমস্ত ক্ষেত্রেই কিষাণের অধিকার থাকবে।

সমগ্র জনসাধারণের প্রচেষ্টায় যদি স্বরাজ অর্জ্জিত হয়, অহিংসার আওতায় যা অবশ্যম্ভাবী, কিষাণরা তাদের স্বকীয় মর্য্যাদা পাবে এবং সব বিষয়ে তাদের অভিমতই হবে চূড়ান্ত। এ যদি না হয়, আর নির্ব্বাচনে সীমাবদ্ধ মতদাতার ভিত্তিতে যদি সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে কোন কাজ চালাবার মত আপোষ হয়, তবে ভূমিকর্ষণকারীর স্বার্থের প্রতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে। ব্যবস্থা-পরিষদ যদি কিষাণদের স্বার্থরক্ষার পক্ষে অনুপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়, তবে চূড়ান্ত প্রতীকারের জন্য অবশ্যই তাদের সামনে আইন অমান্য এবং অসহযোগের পথ খোলা থাকবে। তবে কাগজে লিখিত বিধান সমূহ, ওজস্বিনী ভাষা বা গরম গরম বক্তৃতা ইত্যাদি শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু কাজের হবে না। অহিংস সংগঠনের শক্তি, নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং ত্যাগই হচ্ছে অন্যায় বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রমিকদের অধিকার এবং কর্ত্তব্য

শ্রমসম্বন্ধে আমি এত উচ্চ ধারণা পরিপোষণ করি যে, আমার ভাগ্য আমি শ্রমিকদের সাথে সমসূত্রে গ্রথিত করেছি। এবং বহু বহু বৎসর হ'ল আমি তাদেরই মধ্যে থাকি ও তাদের মত নিজের হাত-পায়ে পরিশ্রম করি। দৈহিক শ্রম করায় আপনি শুধু শরীর-ধর্ম্মই পালন করেন এবং তাই নিজের অবস্থার জন্য অসন্তুষ্ট হবার কিছুমাত্র কারণ নেই। আপনি যে জাতির জন্য পরিশ্রম করচেন, আমি বরং আপনাকে তার অস্থি বলে নিজেকে বিবেচনা করতে বলব। কোটিপতি বা পুঁজিপতি বিনা কোন জাতির চলতে পারে, কিন্তু শ্রমিক বিনা চলা অসম্ভব।

শ্রমিকদের যাঁরা নিয়োগ করেন, তাঁদেরও শ্রমিকদের প্রতি কর্ত্তব্য আছে; কিন্তু আমার মোটামুটি অভিজ্ঞতা হচ্চে এই যে, সাধারণত শ্রমিকরা নিয়োগ-কর্ত্তাদের চেয়ে অধিকতর দক্ষতা এবং সততার সাথে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদিত করে। এ অবস্থায় নিয়োগ-কর্ত্তাদের উপর কতখানি তারা নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে, এ জানা শ্রমিকদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমাদের জন্য যদি যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা না করা হয়, তবে তাদের দেখতে হবে যে কি করে আমরা তা পেতে পারি। তবে শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্যের মান নির্দ্ধারিত করবে কে? নিঃসন্দেহে এর সেরা উপায় হচ্চে এই যে, শ্রমিকরা তাদের দাবী জানুক এবং নিজেদের দাবী আদায় করার উপায় শিখুক ও তারা সে দাবী আদায় করুক। তবে এর জন্য আগে থেকে সামান্য কিছু শিক্ষা পাওয়া দরকার।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবদান যা শ্রমিকরা সৃষ্টি করতে পারে, তা হচ্চে এই যে, তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করবে, আরও বেশী খবরাখবর রাখবে, নিজেদের দাবীর উপর জোর দেবে এবং এমন কি যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী এত পরিশ্রমে তারা তৈরী করে, তার যাতে উপযুক্ত ব্যবহার হয়, তার জন্য তারা মালিকের কাছে দাবী জানাবে। কারখানার আংশিক ভাগীদারের পর্য্যায়ে নিজেদের উন্নীত করতে পারলে শ্রমিকদের সত্যকার ক্রমবিকাশ ঘটবে।

আমাদের সামনে প্রশ্ন হচ্চে এই : বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমিকদের মধ্যে কিছু পরিমাণ চেতনার সৃষ্টি হ'লে তারা কোন্ পন্থা অবলম্বন করবে? শ্রমিকরা যদি তাদের সংখ্যা বা শারীরিক শক্তি অর্থাৎ সহিংস নীতির উপর ভরসা করে, তবে সে হবে আত্মহত্যাকর নীতি। তা হ'লে তারা দেশের শিল্প-সমূহের অনিষ্ট সাধন করবে। এর বদলে খাঁটি ন্যায়ের দিক অবলম্বন করে তার জন্য স্বয়ং নির্য্যাতন ভোগ করলে তারা শুধু যে সর্ব্বদা বিজয়ীই হবে তা নয়, বরং তারা মালিককে শুধরে দিতে পারবে, শিল্পের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করবে এবং মালিক ও শ্রমিক দুই হবে এক পরিবারভুক্তের মত।

শ্রমিক এবং মালিকদের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে ; কিন্তু আমাদের নিজ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করে তার মীমাংসা করতে হবে। বিশুদ্ধ রক্ত যেমন বিষাক্ত বীজাণুর প্রতিরোধ করে, তেমনি খাঁটি হলে শ্রমিকরাও শোষণের প্রতিরোধ করবে। শ্রমিককে বুঝতে হবে যে শ্রমও হচ্চে মূলধন। শ্রমিকরা যখন উপযুক্ত শিক্ষা পাবে, সংগঠিত হবে এবং নিজেদের শক্তি যেই তারা বুঝতে পারবে, তখন যতবড় পুঁজিপতিই হ'ক না কেন, তাদের দাবাতে পারবে না। সুসংগঠিত এবং সচেতন শ্রমিকেরা নিজেদের দেওয়া সর্ত্ত মানতে মালিকদের বাধ্য করবে। নিজেদের দুর্ব্বলতার জন্য কোন শ্রেণী-বিশেষের বিরুদ্ধে

হিংসা প্রচারের অর্থ নেই। আমাদের শক্তিশালী হতে হবে। দৃঢ় চিত্ত, সচেতন মন এবং সহযোগিতায় ইচ্ছুক বাহু সাহসের সাথে যে-কোন অন্যায়ের সম্মুখীন হতে পারে এবং সকল বাধা দূরীভূত করতে পারে।

ধর্ম্মঘট

আজকাল ধর্ম্মঘটের খুব রেওয়াজ উঠেচে। এ হচ্চে অস্থিরতার লক্ষণ। নানা রকমের ভাসা ভাসা ভাবধারা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্চে। এক অনিশ্চিত আশায় সবাই অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেচে এবং এই আশা কোন নির্দ্দিষ্ট রূপ না পরিগ্রহণ করলে পরে বিরাট হতাশা দেখা দেবে। অন্যান্য জায়গার মত ভারতের শ্রমিকসমাজও তথাকথিত উপদেষ্টা এবং পরিচালকবর্গের কৃপার উপর নির্ভরশীল। এরা সব সময় সৎ হয়না এবং অনেক সময় সৎ হলেও বিজ্ঞ হয় না। শ্রমিকরা স্বীয় অবস্থায় সন্তুষ্ট নয়। অবশ্য অসন্তুষ্ট হবার প্রভূত কারণ আছে। সত্যসত্যই তাদের এই শিক্ষা দেওয়া হচ্চে যে নিজেদের তারা যেন মালিকের সম্পদবৃদ্ধির যন্ত্র বলে মনে করে। তাই সামান্য মাত্র প্রচেষ্টাতেই তারা কাজ বন্ধ করে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও ভারতীয় শ্রমিকদের প্রভাবান্বিত করেচে। এ ছাড়া এমন অনেক শ্রমিক নেতা আছেন, যাঁরা ভাবেন যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্ম্মঘট করা উচিত।

এ রকম ব্যাপারে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট করা আমার মতে মারাত্মক ভুল। এ কথা আমি অস্বীকার করি না যে, এ জাতীয় ধর্ম্মঘটে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধিত হবে। তবে এ'কে অহিংস অসহযোগের কার্য্যক্রমভুক্ত বলা যেতে পারে না। শ্রমিকরা দেশের রাজনৈতিক অবস্থাকে না বোঝা পর্য্যন্ত এবং তারা সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শ্রমিকদের ব্যবহার করা যে নিতান্ত বিপজ্জনক, এ কথা বুঝতে বিশেষ বুদ্ধি খাটানোর দরকার হয় না। উপযুক্তভাবে জীবনধারণের জন্য তারা

নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন না করা পর্য্যন্ত, হঠাৎ তাদের কাছে এ রকম ব্যবহার আশা করা যায় না।

সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন করার জন্যই শুধু ধর্ম্মঘট করা উচিত এবং তাদের ভিতর দেশাত্মবোধের উন্মেষ হলে নির্ম্মিত পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্যও ধর্ম্মঘট করা যেতে পারে।

সাফল্যজনক ধর্ম্মঘটের নিয়ম খুবই সোজা এবং এ নিয়ম মেনে চললে কোন ধর্ম্মঘট ব্যর্থ হবেনা।—

১। ধর্ম্মঘটের কারণ ন্যায়সঙ্গত হবে।

২। ধর্ম্মঘটকারীদের মধ্যে কার্য্যত মতৈক্য থাকবে।

৩। যারা ধর্ম্মঘটে যোগদান করেনি তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম হিংসামূলক আচরণ করা হবে না।

৪। শ্রমিক সঙ্ঘের অর্থসাহায্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে ধর্ম্মঘটকারীদের নিজেদের ভরণপোষণের ব্যয়নির্ব্বাহ করতে হবে এবং এইজন্য সাময়িক ভাবে তারা কোন প্রয়োজনীয় লাভজনক বৃত্তি অবলম্বন করবে।

৫। ধর্ম্মঘটকারীদের বদলে যদি বহুসংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায়, তবে সে ধর্ম্মঘটে কোন প্রতীকার হবে না। এ অবস্থায় অন্যায় ব্যবহার হলে বা অপ্রতুল পারিশ্রমিক দেওয়া হলে ইস্তফা দেওয়াই হচ্চে এর একমাত্র প্রতি-কার।

যান্ত্রিকতার অভিশাপ

পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারত কেন যন্ত্রশিল্পে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে? পাশ্চাত্য সভ্যতা নগরকেন্দ্রিক। ইংলণ্ড বা ইটালীর মত ছোট্ট রাষ্ট্র নিজেদের দেশের ব্যবস্থাকে নগরকেন্দ্রিক করতে পারে। আয়তনে বিরাট হলেও ঘনবসতি-পূর্ণ নয় বলে সম্ভবত আমেরিকারও এ পথ ছাড়া গতি নেই। সবাই কিন্তু এ

কথা মানবে যে, প্রচুরজনসাধারণ-অধ্যুষিত বিরাটায়তন একটি দেশ, যেখানে এমন একটি প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতি বিরাজমান, যা তার অতীতের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করচে, সেখানে পাশ্চাত্যের প্রতিরূপের অনুকরণ করার দরকার নেই এবং তা উচিতও নয়। বিশেষ কোন অবস্থায় একটি দেশের পক্ষে যা মঙ্গলজনক, অন্য দেশের পক্ষে তা শুভ নাও হতে পারে। একের পক্ষে যা খাদ্য কখনও কখনও অপরের কাছে তা বিষস্বরূপ হয়।

কোন কাজ করার জন্য কর্ম্মীর সংখ্যা যখন কম হয়, তখন যান্ত্রিকতার প্রয়োজন। ভারতের মত যেখানে কর্ম্মীর সংখ্যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, সেখানে এ প্রথা মঙ্গলজনক নয়। আমাদের গ্রামের প্রভূতসংখ্যক জনসাধারণের জন্য বিশ্রামের বন্দোবস্ত করা আমাদের সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্চে তাদের অবসর সময়, বছরে যা প্রায় ছয় মাসে দাঁড়ায়, তার সদ্ব্যবহার করা, ভারতের সাত লক্ষ গ্রামে যে জীবন্ত যন্ত্র ছড়িয়ে রয়েচে, তার বিরুদ্ধে প্রাণ-হীন যন্ত্রকে প্রয়োগ করা উচিত নয়। যন্ত্রের উপযুক্ত প্রয়োগের অর্থ হচ্চে মানুষের কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহায়তা করা এবং তার শ্রম লাঘব করা। বর্ত্তমানে যে ভাবে যন্ত্রশিল্পের ব্যবহার হয়, তাতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে তাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া হয় এবং সম্পদ ক্রমাগত সঞ্চিত হয় মুষ্টিমেয় জনকয়েকের হাতে।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

রাজন্যবর্গ

আমার আদর্শের ভারতীয় দেশীয় রাজ্য হবে রামরাজ্য। একজন রজকের মন্তব্য থেকে রাম তার মনোভাব বুঝে প্রজানুরঞ্জনের জন্য তাঁর প্রাণপ্রতিম স্বয়ং দয়ার অবতার সীতাকে ত্যাগ করেছিলেন। সামান্য সারমেয়র প্রতিও রাম ন্যায়বিচার করতেন। সত্যের জন্য রাজ্য ত্যাগ করে বনে বাস করায় রাম দুনিয়ার রাজন্যবর্গের সামনে সদাচরণের এক আদর্শ স্থাপনা করে গেছেন। নিজ পত্নীর প্রতি অবিচল নিষ্ঠা দেখিয়ে তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, একজন রাজার পক্ষেও নিখুঁত সংযমপূর্ণ জীবন যাপন করা সম্ভব। জনপ্রিয় শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা তিনি রাজসিংহাসনের গৌরব বাড়িয়েছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে, রামরাজ্যই হচ্চে স্বরাজের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা।

এ রকম রামরাজ্য আজও হতে পারে। রামের বংশ বিনষ্ট হয়নি। বর্ত্তমান কালে প্রথম খলিফা রামরাজ্য স্থাপনা করেছিলেন বলা যায়। আবুবকর এবং হজরত ওমর কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করতেন; কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাঁরা ফকিরের মত থাকতেন। সাধারণের তহবিল থেকে তাঁরা এক পয়সাও গ্রহণ করতেন না। জনসাধারণের প্রতি যাতে ন্যায়বিচার হয়, তার জন্য তাঁরা সদাই সতর্ক থাকতেন। তাঁদের নীতি ছিল এই যে, কেউ যেন শত্রুর সাথেও ছলনা না করে বরং তার সাথে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করে।

যেমন রাজা তেমনি প্রজা, এই সুপ্রচলিত প্রবচনটিকে অর্দ্ধ-সত্য বলা যেতে পারে। এর ঠিক উল্টাটি অর্থাৎ যেমন প্রজা তেমনি রাজা, এই

প্রবচনের চেয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রবচনটি বেশী খাঁটি নয়। প্রজাপুঞ্জ যেখানে হুঁশিয়ার, নিজ অবস্থা বজায় রাখার জন্য রাজা সেখানে সম্পূর্ণরূপে তাদের উপর নির্ভরশীল। প্রজারা ঔদাসীন্যের সুপ্তিতে মগ্ন থাকলে রক্ষাকর্ত্তা না হয়ে রাজার নিপীড়ক হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।

এসব সত্ত্বেও আমি জানি যে, ভারতবর্ষে এমন একদল ব্যক্তি আছেন, যাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, রাজন্যবর্গ কোন রকম সংস্কারের অতীত এবং "অতীতের এই নিষ্ঠুর ধ্বংসাবশেষকে" শেষ না করা পর্য্যন্ত স্বাধীন ভারতের কল্পনা করা অসম্ভব। তাঁদের সাথে আমার সত্যই মতের গরমিল, কারণ অহিংসায় এবং তার ফলস্বরূপ মানুষের সৎ প্রবৃত্তির প্রতি বিশ্বাস থাকার জন্য এ ছাড়া আমার গত্যন্তর নেই। ভারতে তাঁদেরও স্থান আছে। অতীতের যাবতীয় সংস্কারকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করা যায় না। আমি তাই বিশ্বাস করি যে, রাজন্যবর্গ যদি অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলেন, তবে সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে কোনমতে জোড়াতালি দিলে চলবে না। নির্ভীক ভাবে তাঁদের এ সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। আসল ক্ষমতা জনসাধারণের অনুকূলে তাঁদের ছেড়ে দিতে হবে। এই অবস্থা সামলানোর এবং ভারতকে প্রলয়ঙ্কর রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের হাত থেকে বাঁচানোর এ ছাড়া আর কোন মধ্যপথ আছে বলে আমার জানা নেই।

হিন্দু দেশীয় রাজ্য এবং মুসলিম দেশীয় রাজ্য বলার দিন আর নেই। এর প্রমাণ কি? কাশ্মীরের মত বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা-বিশিষ্ট মুসলিম অধিবাসী অধ্যুষিত এক দেশের শাসনকর্ত্তা একজন হিন্দু নৃপতি বলেই কি এ'কে হিন্দুরাজ্য বলা চলে? না হিন্দুদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠতা-বিশিষ্ট হায়দ্রাবাদের শাসক একজন মুসলমান নৃপতি বলেই তাকে মুসলিম রাজ্য বলা যায়? এ রকম আলোচনাকে আমি জাতীয়তাবাদবিরুদ্ধ মনে করি। একজন খৃষ্টীয়ান

রাজা ভারতবর্ষের উপর রাজত্ব করেন বলেই কি এদেশ খৃষ্টীয়ান রাষ্ট্র হয়ে গেছে? যে কেউ রাজত্ব করা সত্ত্বেও ভারত যদি ভারতীয় হয়, তবে শাসক যে কেউ হওয়া সত্ত্বেও দেশীয় রাজ্যগুলিও ভারতীয়। বর্ত্তমানের শাসনকর্ত্তা এবং তাঁর বংশধরেরা জাগ্রত জনমতের সমর্থন ছাড়া রাজত্ব করতে পারেন না। যে জাগরণ আজ দেখা দিয়েচে, তা স্থায়ীরূপ পরিগ্রহ করচে। প্রত্যহ এর গতিবেগ বেড়ে চলেচে। সাময়িকভাবে হয়ত শাসকবর্গ এবং তাঁদের উপদেষ্টাগণ জনসাধারণের শক্তিকে দাবিয়ে রাখতে পারেন। কখনই তাঁরা এর বিনাশ করতে পারবেন না। এতে সাফল্য লাভ করলে ভারতের আত্মাকে ধ্বংস করে ফেলার সামিল হবে। আর একথা কি ধারণায় আনা যায় যে, ছোটবড় যে কোন জায়গায় হ'ক না কেন স্বাধীন ভারত মুহূর্ত্তের জন্য অত্যাচার বরদাস্ত করবে?

কুশাসনের জন্য ইংরেজ সময় সময় কোন দেশীয় নৃপতিকে তিরস্কার করে। রাজন্যবর্গ সাধারণত আরাম এবং বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন করে এসেচেন এবং প্রজাপুঞ্জকে শোষণ করেচেন। রাজকীয় ক্ষমতার অবসান আসন্ন হওয়ায় রাজন্যবর্গ স্বভাবতই এ'কে অভিনন্দন জানাবেন, কারণ তাঁদের উপর যে সার্ব্বভৌমত্বের বোঝা ছিল, এতে তা সরে যাবে। মূঢ়তার বশবর্ত্তী হয়ে কেউ কেউ হয়ত রায়তদের সার্ব্বভৌমত্বের জন্য রুষ্ট হতে পারেন। জনগণের সার্ব্বভৌম ক্ষমতার জন্য তাঁদের গর্ব্ব অনুভব করা উচিত, এতে তাঁদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং তাঁদের সম্মান বাড়বে। তবে এর অর্থ হচ্চে এই যে, তাঁদের প্রথম শ্রেণীর খাঁটি জনসেবক হতে হবে। কাজের দ্বারা তাঁদের সেবার ভাব প্রমাণ করতে হবে। প্রজামণ্ডল বা জনসাধারণের সত্যকার নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁদের কাজ করতে হবে। এই হবে বিজ্ঞতার নিদর্শন, আর শুধু এইভাবে সারা ভারতের সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের জনসাধারণও স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করতে পারবে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সংখ্যালঘু-সমস্যা

স্বাধীনতার সূর্য্য-কিরণ-উত্তাপে সাম্প্রদায়িক-বিভেদ-রূপ তুষারপর্ব্বত যে গলে যাবে এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

সংখ্যালঘু-সমস্যার সমাধান বিনা, ভারতে স্বরাজ বা স্বাধীনতা কিছুই আসবে না। কোন না কোন দিন যে সংখ্যালঘু-সমস্যার স্থায়ী এবং বাস্তব সমাধান করা যাবে এ বিশ্বাস আমার আছে। আমার বহুবার-বলা কথার পুনরাবৃত্তি করে আমি বলতে চাই যে, বিদেশীশাসনরূপ কীলক যতদিন এক সম্প্রদায়কে আর এক সম্প্রদায় থেকে এবং এক শ্রেণীকে অপর শ্রেণী থেকে পৃথক করে রাখবে, ততদিন কোনরকম স্থায়ী এবং বাস্তব সমাধান হবে না এবং এই সব বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে কোন রকম স্থায়ী সখ্যও স্থাপিত হবে না। এই কীলক অপসারিত করামাত্র আপনাদের কি মনে হয় যে, এই ঘরোয়া সম্বন্ধ, পারিবারিক প্রীতি, একই পূর্ব্বপুরুষ হতে উদ্ভূত হবার সংবাদ ইত্যাদির কোন মূল্যই থাকবে না? দেশে যখন ব্রিটিশ রাজত্ব ছিল না বা যখন কোন ইংরেজের মুখ দেখা যেত না, তখন কি হিন্দু, মুসলমান, শিখ ইত্যাদি পরস্পর লড়াই করত? হিন্দু এবং মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি যে, সে সময় আমরা অপেক্ষাকৃত শান্তিতে ছিলাম, আর আজও গ্রামের হিন্দু-মুসলমানেরা মোটে বিবাদ করে না। এ দ্বন্দ্ব বিশেষ প্রাচীন নয়। জোর করে আমি এ কথা বলতে পারি যে, এ হচ্ছে ইংরেজদের আগমনের সমসাময়িক, এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ভারতের মধ্যে এই দুর্ভাগ্যজনক কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্ত্তে সেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে এবং উভয়

দলের বোঝাপড়ার ফলে স্বেচ্ছায় যখন ব্রিটেন তার অধিকার ছেড়ে দেবে, তখনই দেখা যাবে যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইউরোপীয়, ইঙ্গ-ভারতীয়, খৃষ্টীয়ান এবং অস্পৃশ্য ইত্যাদি সবাই সম্মিলিত ভাবে এক হয়ে বসবাস করচে।

স্বাধীন ভারতে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা রাখলে চলবে না, তবে সংখ্যালঘুদের উপর চাপ না দেওয়া যদি স্বাধীন শাসনব্যবস্থার অর্থ হয়, তবে সকল সম্প্রদায়ের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করতে হবে।

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সংখ্যার অনুপাতে কখনই চাকরীর বাঁটোয়ারা হওয়া উচিত নয়। জাতীয় সরকারের হাতে শিক্ষায় অনগ্রসর সম্প্রদায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাবার অধিকার থাকবে। কিন্তু দায়িত্বশীল সরকারীপদে অধিষ্ঠিত হতে যারা ইচ্ছুক তাদের অবশ্যই যথোপযুক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন

সংখ্যাগরিষ্ঠদের শাসন কথাটি সাধারণত সঙ্কীর্ণ অর্থে, অর্থাৎ খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠদের কাছে নতি স্বীকার করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠদের সিদ্ধান্ত যাই হ'ক না কেন সর্ব্বদা তার অধীন থাকার অর্থ হচ্চে দাসত্ব। যেখানে জনসাধারণ মেষপালের মত আচরণ করে, তাকে গণতান্ত্রিক অবস্থা বলা চলে না। গণতন্ত্রে ব্যক্তিগত মতামত এবং কার্য্যের স্বাধীনতা সততার সঙ্গে রক্ষিত হয়। সুতরাং আমার বিশ্বাস এই যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিরুদ্ধ আচরণ করার পূরা অধিকার সংখ্যালঘিষ্ঠদের আছে।

নিজেরা আমরা যেমন চিন্তা ও কর্ম্মের স্বাধীনতা চাই, তেমনি অপরকেও এ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠদের দমনমূলক শাসনব্যবস্থা আমলাতান্ত্রিক সংখ্যালঘিষ্ঠের মতই অসহ্য। যুক্তি দ্বারা অভিভূত করে ধৈর্য্য সহকারে সংখ্যালঘিষ্ঠদের আমাদের মতানুবর্ত্তী করতে হবে। পরের হুকুমের

বশবর্ত্তী হয়ে এবং শাস্তির ভয়ে কোন কাজ করতে শিক্ষা লাভ করায়, সম্ভবত আমরা আমাদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির আস্বাদ পাবার পর, আমাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বলের উপর, আমাদের শাসকবর্গ আমাদের উপর যে অন্যায় ব্যবহার করতেন, উচ্চমাত্রায় তারই পুনরাবৃত্তি করব। এ হবে প্রথমোক্ত অবস্থার চেয়েও খারাপ।

বহুবার আমি এ কথা বলেচি যে, কোন দলই ন্যায়বিচারের একচেটিয়া অধিকার নিয়ে বসে নেই। সবাই আমরা ভুল করতে পারি এবং কখনও কখনও আমাদের সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করে থাকি। এ রকম এক বিরাট দেশে নানা রকম মতবাদের স্থান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং নিজের এবং অপরের কাছে ন্যূনতম কর্ত্তব্য হচ্চে এই যে, আমরা যেন বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে চেষ্টা করি এবং যদি তা গ্রহণ নাও করি তবু তাদের কাছ থেকে আমরা যেমন আশা করি যে তারা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকে শ্রদ্ধা করুক, তেমনি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীকেও আমরা যেন শ্রদ্ধা করি। সুস্থ লোকজীবনের এ হচ্চে এক অপরিহার্য্য অঙ্গ আর সেই জন্য এ'কে বলা চলে স্বরাজের যোগ্যতার নিদর্শন। ঔদার্য্য এবং সহিষ্ণুতা যদি আমাদের না থাকে, তবে কখনই আমরা আপোষে আমাদের বিরোধের মীমাংসা করতে পারব না। সুতরাং সর্ব্বদাই আমাদের তৃতীয় পক্ষ অর্থাৎ বিদেশী শক্তিকে সালিশী মানতে হবে।

এ দেশে যারা জন্মগ্রহণ করে এবং লালিত পালিত হয় এবং অন্য কোন দেশের উপর যারা নির্ভর করে না—হিন্দুস্থান তাদের সকলের। সুতরাং যতখানি এ দেশ হিন্দুদের, ঠিক ততখানিই আবার পার্শি, বেনে ইস্রাইল, ভারতীয় খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং অন্যান্য অহিন্দুদের। স্বাধীন ভারত হিন্দুরাজ হবে না, এ হবে ভারতীয় রাজ, আর এর ভিত্তি কোনরকম ধর্ম্মগত দল বা সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর রচিত হবে না। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিচারে সমস্ত

জনসাধারণের প্রতিনিধি নিয়ে এ গঠিত হবে। অন্যান্য সম্প্রদায়গুলি মিলে হিন্দুদের সংখ্যালঘিষ্ঠে পর্য্যবসিত করতে পারে। তাঁরা নির্ব্বাচিত হবেন তাঁদের প্রতিভা এবং সেবার দ্বারা। ধর্ম্ম হচ্চে ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং রাজনীতিতে এর স্থান হওয়া অনুচিত। বিদেশী শাসনের কৃত্রিম ফল স্বরূপ আজ আমরা ধর্ম্মের ভিত্তিতে রচিত নানা রকম অস্বাভাবিক বিভেদ দেখছি, বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হলে বাজে আদর্শ এবং ধুয়ো আঁকড়ে থাকার জন্য আমাদের নিজেদেরই হাসি পাবে।

ইউরোপীয় এবং ইঙ্গ-ভারতীয়দের ভবিষ্যৎ

জনসাধারণের সাথে নিজেদের একাত্ম করে ফেললে যে-কোন বিদেশী সানন্দে এখানে বসবাস করতে পারে। নিজেদের স্বার্থের রক্ষাকবচ নিয়ে যে সব বিদেশী এ দেশে থাকতে চায়, ভারত তাদের বরদাস্ত করতে পারে না। এর অর্থ হবে এই যে, তারা এখানে উঁচুদরের লোক হয়ে থাকতে চায়, এবং এ অবস্থায় দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য।

ধরে নেওয়া যাক যে, বিদেশী শাসনের অবসান ঘটেচে। এ অবস্থায় বিদেশীরা কি করবে? ইংরেজ সৈন্যবাহিনী যে-সময় তার রক্ষণাবেক্ষণ করত সে-সময় যে সে স্বাধীন ছিল, একথা কোনমতে বলা চলে না। স্বাধীন মানুষ হিসাবে সে বুঝতে পারবে যে, ভারতের জনগণ যে-সব সুযোগ সুবিধা পায় না তা উপভোগ করা তার পক্ষে অন্যায়। ভারতের উপযুক্ত সন্তানের মত সে তার কর্ত্তব্য করে জীবন ধারণ করবে। ভারতের বিনষ্টির বিনিময়ে সে আর কোনমতেই জীবন ধারণ করবে না। বরং তার যাবতীয় প্রতিভা সে ভারতকে উজাড় করে ঢেলে দেবে এবং যে-দেশকে সে নিজের বলে গ্রহণ করেচে, সেবার দ্বারা সে-দেশের কাছে সে অপরিহার্য্য হয়ে উঠবে।

ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে যদি এ কথা সত্য হয়, তবে ইঙ্গ-ভারতীয় ইত্যাদি যাঁরা ইউরোপীয়-শ্রেণীভুক্ত হয়ে বিশেষ অধিকার পাবার জন্য ইউরোপীয় চাল-চলন এবং আদব-কায়দা গ্রহণ করেছেন, তাঁদের পক্ষে এ আরও কত সত্য! এঁরা সকলে আজ পর্য্যন্ত যে-সমস্ত পক্ষপাতমূলক আচরণ পেয়ে এসেচেন তা বজায় থাকবে বলে যদি আশা করেন, তবে ভবিষ্যতে তাঁরা নিজেদের এক অস্বস্তিকর অবস্থায় নিমজ্জিত দেখতে পাবেন। যে পক্ষপাতমূলক ব্যবহার পাবার স্বপক্ষে কোন যুক্তি নেই এবং যা তাদের আত্মমর্য্যাদার পক্ষে অপমানজনক, তার ভার থেকে তাঁদের মুক্ত করলে তাঁদের বরং কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

তাঁর রাজনৈতিক অধিকার নষ্ট হবার আশঙ্কা নেই। তাঁর বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থাই শুধু পরিবর্ত্তিত হবে। ভারতীয় বংশমর্য্যাদা তিনি অস্বীকার করেন এবং ইউরোপীয়দের দ্বারাও অনাদৃত হন। তাঁর অবস্থা হচ্চে দু নৌকোয় পা দেবার মত। কখনও কখনও এঁদের সাথে আমার দেখা হয়। সামর্থ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করতে গিয়ে এবং ইউরোপীয়দের মত বেশভূষা করে তাদের মত থাকতে গিয়ে এঁরা একেবারে ফতুর হয়ে পড়েন। পথ বেছে নেবার জন্য আমি তাঁদের অনুরোধ জানিয়েচি এবং বিপুলসংখ্যক জনসাধারণের সাথে তাঁদের ভাগ্যকে সখ্যসূত্রে গ্রথিত করতে বলেচি। অতীব সরল এবং স্বাভাবিক এই অবস্থাকে হৃদয়ঙ্গম করার সৎসাহস এবং দূরদৃষ্টি যদি এই সমস্ত নরনারীর থাকে তবে তাঁরা নিজেদের উপকার করবেন, ভারতের মঙ্গল করবেন, এবং যে নৈরাশ্য-জনক অবস্থায় তাঁরা আছেন তার থেকে মুক্তি পাবেন। যুক ইঙ্গ-ভারতীয়দের সামনে সবচেয়ে জরুরী সমস্যা হচ্চে তাঁদের সামাজিক অবস্থা নির্দ্ধারিত করা। নিজেকে ভারতীয় মনে করা মাত্র, এবং সেই রকম ভাবে জীবনযাত্রা পরিচালনা করা মাত্র, তিনি বেঁচে যাবেন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

কেমন করে গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া যায়

একটি বন্ধু নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি পাঠিয়েছেন :

১। বরাবরই আপনি এই অভিমত পোষণ এবং ব্যক্ত করে এসেচেন যে, কোন ব্যক্তি গুণ্ডা আদি দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও তার আচরণ খাঁটি অহিংস হওয়া উচিত। কোন নারী যখন আক্রান্তা বা অপমানিতা হবে তখনও কি একথা প্রযোজ্য? অহিংসা সম্বন্ধে আপনার নির্দ্দেশ যদি জনসাধারণ অনুসরণ না করতে পারে তবে তাদের আপনি কি ভীরুর মত মরতে বলবেন, না, সহিংস উপায়ে অত্যাচার প্রতিরোধ করতে বলবেন?

২। মুসলিম লীগ আজ যে দুমুখো নীতি গ্রহণ করেচে, তাকে কি আপনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করবেন না? একদিকে যখন এর নেতৃবর্গ খোলাখুলি ভাবে হিন্দুদের বিরুদ্ধে হিংসা প্রচার করেচেন এবং জেহাদ ঘোষণা করেচেন, অন্যদিকে এরাই আবার মন্ত্রিত্বের পদারূঢ় হয়ে রয়েচেন এবং পুলিশ ও বিচার-বিভাগসহ যাবতীয় শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণভার এঁদেরই হাতে রয়েচে।

৩। উপযুক্ত-ক্ষমতা-সম্পন্ন এমন কোন কর্ত্তৃপক্ষ কি ভারতে নেই যে, এই জাতীয় অভূতপূর্ব্ব অনাচারের অবসান ঘটাতে পারে?

৪। আপনি কি বুঝতে পারচেন যে, এরকম অবস্থা যদি চলতে দেওয়া হয়, তবে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য্য? এরকম সঙ্কট এলে তার সম্মুখীন হবার জন্য দেশবাসীর প্রতি আপনার উপদেশ কি?

উত্তর—

১। আমার কল্পিত সমাজ-ব্যবস্থায় প্রশ্নকর্ত্তা-কর্ত্তৃক বর্ণিত অপমান সংঘটিত হবে না। তবে যে সমাজে আমরা বাস করচি সেখানে এ রকম অপমানজনক ঘটনা অবশ্যই ঘটে থাকে। এবিষয়ে আমার জবাব সুস্পষ্ট। আত্মরক্ষার জন্য বা নারীর সম্মান রক্ষার জন্য, ক্রোধ, জিঘাংসা বা প্রতিশোধের মনোভাব শূন্য হয়ে অহিংস নরনারী মৃত্যুবরণ করবে। এই হচ্চে সাহসিকতার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা।

জীবনের এই সুমহান দর্শন, যাকে ভুলবশত আমার নির্দ্দেশিত পথ বলা হয়, তাকে একজন বা একদল লোক যদি অনুসরণ করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হয়, তবে প্রথম নীতির চেয়ে বহুগুণে নিকৃষ্ট হলেও আমৃত্যু প্রতিরোধ করাই হচ্চে দ্বিতীয় পথ। ভীরুতা হচ্চে দুর্ব্বলতার নামান্তর এবং হিংসার চেয়েও এ খারাপ। ভীরুর প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছা থাকে, কিন্তু মরার সাহস না থাকায় আত্মরক্ষার জন্য সরকারী ক্ষমতা ইত্যাদি বহিঃশক্তির দ্বারস্থ হয়। ভীরুকে মানুষ আখ্যা দেওয়া চলে না। মানবসমাজের সদস্য হবার যোগ্যতা তার নেই। সর্ব্বশেষে আমি এই কথা বলব যে, নারী-সমাজ যদি আমার পরামর্শ গ্রহণ করে তবে তাদের অন্য কোন ভ্রাতাভগ্নীর সাহায্যের প্রত্যাশী না হয়েই প্রত্যেক নারী নিজেকে রক্ষা করতে পারবে।

২। যে দ্বৈত-নীতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েচে, নিঃসন্দেহেই তা খারাপ। আমাদের জাতীয় জীবনের এ এক দুঃখজনক অধ্যায়। এ'কে আমি সর্ব্বতোভাবে নিন্দা করি। সৌভাগ্যবশত এ এতই খারাপ যে, বেশীদিন চলতে পারে না।

৩। একমাত্র ক্ষমতাসম্পন্ন কর্ত্তৃপক্ষ হচ্চে ইংরেজ। আমরা সবাই তাদের হাতের পুতুল। তবে এই কর্ত্তৃপক্ষকে দোষ দেওয়া বোকামী তো

বটেই, ভুলও। নিজস্বভাব অনুযায়ী এ চলেচে। কর্ত্তৃপক্ষ তো আমাদের পুতুল হতে বাধ্য করেনি। স্বেচ্ছায় আমরা তাদের কাছে দৌড়ে যাই। ব্রিটিশের ইঙ্গিতে পরিচালিত না হওয়া প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন।

তবে একথা আমাদের খোলাখুলি স্বীকার করা দরকার যে, ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ভারত ত্যাগের চেষ্টা করচেন। কেমন করে, তা অবশ্য তাঁরা জানেন না। সত্যসত্যই তাঁরা ভারত ত্যাগ করতে চান,—তবে এ পর্য্যন্ত যেসব অবিচার করে এসেচেন, যাবার আগে তার প্রতীকার করতে চান।

কর্ত্তৃপক্ষকে আমি বলে আসচি যে, সত্বর যদি অন্যায়ের প্রতীকার করতে চান, তবে ভারতকে তার বিধিলিপির উপর ছেড়ে চলে যান। কিন্তু বর্ত্তমান ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ এই সুস্পষ্ট সত্যটিকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। আমাদের চেয়েও তাঁরা ভারতবর্ষকে ভাল ভাবে জানেন, এই বিশ্বাসে তাঁরা মত্ত। সাফল্য সহকারে এক শতাব্দীর অধিক আমাদের অধীন রাখার পর, নিজেদের তাঁরা আমাদের ভাগ্যবিধাতা বলে দাবী করেন। শান্তির পথে আমরা যদি স্বীয় আদর্শে উপনীত হতে চাই তবে আমাদের কোন রকম অনুযোগ করার প্রয়োজন নেই। সত্যাগ্রহ কখনই প্রতিহিংসাপরায়ণ মনোবৃত্তি-প্রসূত নয়। ধ্বংস নয়, হৃদয়ের পরিবর্ত্তনই এর লক্ষ্য। এই নীতির অভ্যন্তরীণ গলদের জন্য নয়, সত্যাগ্রহীর দুর্ব্বলতার জন্য এ ব্যর্থ হতে পারে। যে কারণেই হ'ক না কেন, ভারত-ত্যাগের সিদ্ধান্ত করার পর ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ব্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতির নিদর্শন দেখাবেন। বিবদমান দলসমূহ ক্রমশ ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের অন্তঃসারশূন্যতার প্রমাণ পাবে। আজকালকার হিন্দু-মুসলমানদের মত এই বিরোধী দল দুটি যদি পরস্পর ঝগড়া করে, তবে তাদের উভয়ের কিংবা যে-কোন এক দলের বোঝা উচিত যে, ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীন জাতি হিসাবে গড়ে উঠতে হয়, তবে সাহায্যের জন্য তাদের ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কৃপা-প্রত্যাশী হওয়া উচিত নয়।

৪। এবার আমি শেষ প্রশ্নে এসে উপনীত হয়েচি। এখনও আমরা গৃহযুদ্ধের সম্মুখীন হইনি। তবে আমরা এর নিকটবর্ত্তী হচ্চি। বর্ত্তমানে এ নিয়ে আমরা ছেলেখেলা করচি। (ব্যাপকভাবে সমস্ত জাতি মিলে গুণ্ডামী করার ভদ্র নাম হচ্চে যুদ্ধ।) ব্রিটিশ যদি বিজ্ঞ হয়, তবে এর থেকে তফাতে থাকবে। তবে তাদের বর্ত্তমান হালচাল দেখে ঠিক এর বিপরীত বোধ হচ্চে। এমন কি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপরিষদের ইংরেজ সদস্যবৃন্দ একথা বুঝতে চান না যে, ন্যায়বিচারের বশবর্ত্তী হয়ে নয়, শুধু ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এবং হিন্দু-মুসলমানদের পৃথক করে রাখার জন্যই, ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের আইন অনুযায়ী, তাঁদের ব্যবস্থাপরিষদে আসন দেওয়া হয়েছিল। এ ভুল তাঁদের নজরে পড়ে না। এ একটি সামান্য ব্যাপার হতে পারে, তবে হাওয়া যে কোন্ দিকে বইচে, এতে তা বোঝা যায়। এসব চিহ্ন দেখে স্বরাজকামী বা স্বরাজপ্রেমীদের হতাশ হলে চলবে না। আমার পরামর্শ হচ্চে সত্যাগ্রহই প্রথম ও শেষ পন্থা। স্বাধীনতা লাভের আর কোন ভাল বা আলাদা উপায় নেই। স্বাধীনতার মুক্ত বায়ুর পরশ যাঁরা পেতে চান, তাঁদের সৈন্যবাহিনী বা পুলিশের সাহায্য চাওয়ার বিরুদ্ধ মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে হবে। সর্ব্বদা তাঁরা নিজেদের সবল বাহুর উপর বা এর চেয়েও যা বহু গুণে শ্রেয়ঃ তাঁদের সেই দৃঢ় মনোবল বা ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করবেন। এ শক্তি তাঁদের নিজের বা অপর কারও হস্তধৃত অস্ত্রের অধীন নয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

ভারত এবং বিশ্বশান্তি

আমার বিশ্বাসের পুনরুক্তি করে আমি বলতে চাই যে, যুদ্ধ এবং তার আনু-ষঙ্গিক বিরাট প্রবঞ্চনা ইত্যাদির উপর ভরসা ছেড়ে দিয়ে, মিত্র শক্তিবর্গ, সমস্ত জাতি ও রাষ্ট্রের সমানাধিকারের ভিত্তিতে খাঁটি শান্তি গড়ে তুলতে কৃত-নিশ্চয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাদের বা জগতের শান্তি নেই। যাবতীয় দ্বন্দ্বের অবসানকল্পে সচেষ্ট দুনিয়ায় একজাতির উপর অন্যের আধিপত্য বা শোষণের স্থান থাকতে পারে না। শুধু এই রকম দুনিয়াতেই সামরিক শক্তিতে দুর্ব্বল জাতিপুঞ্জ শোষণ বা অত্যাচারের ভয় না করে টিকে থাকতে পারে।

পরস্পরসংগ্রামরত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আজ আর বিশ্বের মনীষী-দের অভিপ্রেত নয়। মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের এক ফেডারেশনই তাদের কাম্য। এ আদর্শের পরিপূর্ত্তির হয়ত নিকট ভবিষ্যতে সম্ভাবনা নেই। আমাদের দেশের জন্য আমি একটা বিরাট কিছু দাবী করতে চাই না। তবে স্বতন্ত্রের বদলে বিশ্বজনীন পারস্পরিক নির্ভরশীলতার নীতি গ্রহণ করতে আমাদের ব্যগ্রতার কথা ঘোষণা করাকে আমি খুব একটা বিরাট বা অসম্ভব ব্যাপার মনে করি না।

ভারত কখনও কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। নিছক আত্মরক্ষার জন্য কখন কখন ভারত অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত প্রতিরোধবাহিনী খাড়া করেচে। সুতরাং তার মনে আর শান্তির আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করাতে হবে না। জানা থাক্ আর নাই থাক্, শান্তির আকাঙ্ক্ষা ভারতের প্রভূত পরিমাণে আছে, শোষণকারীর বিরুদ্ধে সাফল্য সহকারে শান্তিময় প্রতিরোধ প্রয়োগ করে ভারত

শান্তির সহায়তা করতে পারে। অর্থাৎ তাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে হবে। এ যদি ভারত করতে পারে, তবে বিশ্বশান্তির জন্য এই হবে একটি জাতির শ্রেষ্ঠতম অবদান।

আমাদের জাতীয়তাবাদে অপর কোন জাতির ক্ষতি হবে না; যেমন কাউকে আমরা আমাদের শোষণ করতে দেব না, তেমনি আমরাও কাউকে শোষণ করব না। স্বরাজ মারফৎ আমরা সমগ্র জগতের সেবা করব।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

"আলোয় নিয়ে চল প্রভু অন্ধকারের মাঝ হতে"

১৯৪৭ খৃঃ অব্দের ৬ই জুলাই দিল্লীতে প্রার্থনাসভায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধী বললেন যে, আসন্ন পূর্ণস্বাধীনতার মত এক মহান ঘটনা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে যতখানি উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক, তা দৃষ্টি-গোচর না হবার কারণ হচ্চে এই যে, দেশ এমন দুটি ভাগে বিভক্ত হতে চলেচে, যা দুটি সশস্ত্র শিবিরে পরিণত হবে।. কারণ রাষ্ট্র দুটির কোন সাধারণ দেশরক্ষা-বাহিনী থাকবে না। সৈন্যবাহিনীকে বিভক্ত করা হবে। এতদুদ্দেশ্যে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বিত হচ্চে। ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করার সেই কষ্টদায়ক অথচ গৌরবজনক দিনে গর্ব্ব করে লোকে বলত যে. স্বাধীন ভারতে মারাত্মক দ্বন্দ্ব ইত্যাদি দমনের জন্য সৈন্যবাহিনীর কোন প্রয়োজন হবে না, কারণ এ জাতীয় দ্বন্দ্ব তখন সংঘটিত হবে না এবং একথাও লোকে বলত যে, বৈদেশিক আক্রমণের প্রতিরোধের জন্যও তাদের কোন রক্ষী-বাহিনীর প্রয়োজন নেই।

কিন্তু, হায়, এখন তাদের সামরিক খাতে বহু ব্যয় করতে হচ্চে এবং নিকট ভবিষ্যতে এ ব্যয়ভার হ্রাসপ্রাপ্ত হবার কোন লক্ষণ নেই। বরং তিনি দেখেচেন যে, "শুধু নিজেদের মধ্যে লড়াই করার জন্য" যথার্থই সামরিক খাতে ব্যয়ভার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্চে। জাতিগঠনমূলক কাজে বা শিক্ষা ইত্যাদির জন্য নয়, রণসম্ভারের পরিমাণ বৃদ্ধি করার হাস্যকর প্রতিযোগিতায়, তারা অর্থ ব্যয় করতে যাচ্ছে। এ সবই শুধু পরস্পরকে হত্যা করার জন্য।

এর মধ্যে তৃপ্তি বা গৌরবের কিছু তিনি খুঁজে পান না। এ দৃষ্টিভঙ্গী দুঃখপ্রদ। প্রিয় বলে গর্ব্ব করার জন্য যা কিছু তাঁরা শিখেছিলেন, তা বর্জ্জন করার প্রস্তুতির নামই কি ভারতের স্বাধীনতা? আত্মগরিমায় মগ্ন না হয়ে এ হচ্চে গভীর আত্মবিশ্লেষণের সময়। বিগত তিরিশ বছর ধরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক হওয়ায়, যথার্থই তিনি নিজের মধ্যে বহু প্রশ্নের জবাব খুঁজে বেড়াচ্চেন। এ দ্বন্দ্বকে কি এই জন্য মহৎ আখ্যায় ভূষিত করা হচ্চে যে, আমরা যেন দ্রুত এই রকম অগৌরবজনক পরিণতিতে উপনীত হই। বৈদিক ঋষিদের সুরে সুর মিলিয়ে তিনি বলবেন, "আলোয় নিয়ে চল প্রভু অন্ধকারের মাঝ হ'তে,"

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই প্রার্থনাসভায় গান্ধীজী বললেন: "আসন্ন স্বাধীনতা কেন উদ্দীপনার সঞ্চার করচে না, কাল সন্ধ্যায় আমি তা বলেচি। ইচ্ছা থাকলে কেমন করে এই বিপদকে আশীর্ব্বাদে রূপান্তরিত করা যায়, সে কথা আজ আমি বলব। অতীতকে নিয়ে মেতে থাকলে বা এ-দল ও-দলের প্রতি দোষারোপ করলে লাভ আমাদের কিছুই নেই। আইনত স্বাধীনতা এখনও আসেনি, আর কয়েক দিন দেরী আছে। বস্তুত দলগুলি সব সম্মিলিত ভাবে এ অবস্থায় রাজী হবার পর, এর পরিবর্ত্তনের কথা আর উঠতে পারে না। ঈশ্বরের দুর্জ্জ্ঞেয় বিধানই একমাত্র পারে মানুষের স্থির করা ব্যবস্থা পাল্টে দিতে।

"এ'কে এড়ানোর একটি সোজা এবং কার্য্যকরী পন্থা হচ্চে বড়লাটের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সম্মিলিত ভাবে কংগ্রেস এবং লীগের একটি বোঝাপড়া করা। লীগকে প্রথমে উদ্যোগী হতে হবে। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার পরামর্শ আমি দিচ্চি না। এ'কে যে-কোন রকম তর্কবিতর্ক বা সমালোচনার উর্দ্ধে একটি প্রমাণিত সত্য বলে ধরে নেওয়া যাক। কিন্তু জন দশেক প্রতিনিধির স্থান সঙ্কুলান হতে পারে এমন একটি কুঁড়ে ঘরে তাঁরা একসাথে বসতে পারেন এবং

কোন সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন না হবার অঙ্গীকার করতে পারেন। এ রকম ঘটনা যদি ঘটে তবে আমি সাহসের সাথে শপথ করে বলতে পারি যে, দুটি সমান-মর্য্যাদা-সম্পন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত করে যে-আইনের খসড়া ভারতের স্বাধীনতা মেনে নিয়েচে, যথার্থই এ হবে তার চেয়ে মঙ্গলজনক।

"তাদের অসহায় অবস্থার সামনে যা ঘটছে তাতে হিন্দু বা মুসলমান কেউ সুখী নয়। যেসব হিন্দু এবং মুসলমান প্রত্যহ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বা আমাকে চিঠি লেখেন, তাঁরা যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা না করে থাকেন তবে এ হচ্চে প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য, কিন্তু—এ শুধু একটা বিরাট কিন্তুই—আমি বোধ হয় অসম্ভব কিছু প্রত্যাশা করচি। ইংরেজ এই চাল চালার পর লীগ যে তার প্রতিপক্ষের কাছে নতিস্বীকার করবে এবং ভাই ও বন্ধুর মত উভয় দলের মধ্যে একটি সম্মিলিত বোঝাপড়া হবে, কেমন করে এ আশা করা যায়?

"আর একটি বিকল্প-পরিকল্পনা আছে, এত না হ'লেও যা অন্তত প্রভূত-আয়াসসাধ্য। যে জনসাধারণ আজ পর্য্যন্ত এক সাধারণ আদর্শের খাতিরে (সে আদর্শ যাই হ'ক না কেন) কাজ করে এসেচে, আজ তাদের পরস্পর-বিরোধী দুটি দলে বিভক্ত করায় প্রত্যেক ভারতহিতৈষীই আতঙ্কিত হবেন। সার্ব্বজনিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য নয়, একে অপরকে ধ্বংস করার জন্য এবং আমৃত্যু পরস্পর লড়াই করা ছাড়া এরা অন্য কোন কাজের অনুপযুক্ত একথা বিমূঢ় বিশ্বের সামনে প্রমাণ করার জন্যই কি এই দুটি পৃথক দল গঠিত হবে?

"এই সম্ভাবনাকে এই জন্য আমি এমন চূড়ান্ত রকমের নগ্নভাবে চিত্রিত করেচি যে, প্রত্যেকে যেন এ দেখতে পায় ও এপথ বর্জ্জন করে। এর থেকে রেহাই পাবার বিকল্প-প্রস্তাবটিও নিঃসন্দেহে হৃদয়গ্রাহী। বিপুলসংখ্যক হিন্দু,

এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা, যথোপযুক্ত দূরদর্শিতার সাথে কি এই সঙ্কটকে হৃদয়ঙ্গম করবেন এবং সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে এখনই এই শপথ গ্রহণ করবেন যে, ভারতীয় ইউনিয়ন বা পাকিস্তান যেখানেই হ'ক, তাঁদের মুসলিম ভ্রাতৃবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার জন্ত তাঁরা কোন সৈন্যবাহিনী রাখতে ইচ্ছুক নন, বা নিতান্ত যদি সৈন্যবাহিনী থাকেও, তাদের কখনও এ কাজে নিযুক্ত করতে ইচ্ছুক নন। হিন্দু এবং তার সহযোগীদের বিগত তিরিশ বছরের দুর্ব্বলতাকে অপরূপ শক্তিতে রূপায়িত করতে বলা, এবং এই প্রস্তাব, এই দুয়ের তাৎপর্য্যই এক। এভাবে সমস্যাকে চিত্রিত করা হয়ত এর অসঙ্গতির পরিচায়ক—হ'তে পারে হয়ত বহুদিন আগে থেকেই ভগবান মানুষের মূঢ়তাকে বিজ্ঞতায় রূপায়িত করে আসচেন। তবে জনগণকে আত্মধ্বংসী দুটি সংগ্রামশীল দলে বিভক্ত করায় যে সমস্ত দল অংশগ্রহণ করেচে, তাদের কাছে এ প্রচেষ্টার মূল্য আছে॥"

—শেষ—